মোহিনী মায়া

আশাপূর্ণা দেবী

স্টল নং—২১ ॥ ব্লক নং—৫
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ পুস্তকালয়

প্রথম মুদ্রণ
মাঘ ১৩৬৮

প্রকাশক :
তনুশ্রী বিশ্বাস,
বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১।

মুদ্রক :
বর্ণশ্রী প্রেস,
১/১ এ বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬।

রকেটের যুগে যুগও রকেটের বেগে দৌড়চ্ছে বৈ কি।

সমাজের চেহারা এবেলা-ওবেলা পাল্টাচ্ছে। কাল যা' ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে, আজ তা' অনায়াসে ঘটে যাচ্ছে। লোকে সেই অবিশ্বাসের দিকে পরম ঔদাসীন্যে তাকিয়ে দেখছে। তাল ঠুকে ছি ধিক্কার করবার উৎসাহ কারো নেই।

যেখানে যা কিছু পুরানো চিন্তা ভাবনা, বিশ্বাস, মুল্যবোধ ছিল, সব যেন পুরনো ঘুনে ধরা কাঠের মত অলক্ষ্যে ঝুরো ঝুরো হয়ে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে সে খেয়ালই হচ্ছে না কারো। আর এ খেয়ালও হচ্ছে না—কেমন করে আর কোন কোন সূত্রে 'ভয়' জিনিসটাও চলে যাচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছে। কেউ আর কোনো কিছুতেই ভয় পাচ্ছে না।

যে মেয়েদের মায়েরা একদা গলাভোর ঘোমটা দিতো আর এখনো মাথা তুলে কিছু বলতে শেখেনি—'কর্তার ইচ্ছে' বহন ক'রে ক'রে টিকিয়ে টিকিয়ে এগিয়ে চলেছে যেন ছোট লাইনের রেলগাড়ীর মতো, সেই সব মেয়েরাই মায়েদের হাতের দইয়ের কৌটা আর আশীর্বাদের ফুল নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর এপিঠ থেকে ওপিঠ।

এযুগে মেয়েদের সম্পর্কে 'কর্তাদের ইচ্ছার আলাদা' রূপ। যাঁরা স্ত্রীকে এখনো নিজের বন্ধুদের সামনে বার করেন না, তাঁরাই মেয়েদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়ে তাদের জন্যে স্কলারশিপ সংগ্রহের চেষ্টায় আর পাস্‌পোর্টের তদ্বিরে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এক করেছেন এবং সেটা ঘটিয়ে তুলতে পারলেই বিনা দ্বিধায় রূপসী, স্বাস্থ্যবতী, তরুণী কন্যাকে একাকিনী আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছেন, সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। আর তা নিয়ে গর্ববোধ করছেন। বর্তমান সমাজের সত্যিকার চেহারা কি, সেটা এযুগে সঠিক বলা শক্ত।

কিন্তু কলকাতা এক আজব শহর।

সেখানে যেমন যুগের এই দ্রুত পরিবর্তনের রূপ সবচেয়ে প্রখর, প্রবল, স্পষ্ট, তেমনি আবার সেইখানেই খানাখন্দে বর্ষার জল জমে থাকার মতো জায়গায় জায়গায় স্থির হয়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়া।

হয়তো বিংশ শতাব্দীর যে ভূমিতে একবিংশ এখুনি উঁকি মারতে চাইছে, ঠিক তার পাশের ভূখণ্ডেই ওই উনবিংশ শতাব্দী শিকড় গেড়ে বসে আছে। দক্ষিণে-বাতাস এদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। 'উত্তরে যে হিমাচল' সেটা এই আশ্চর্য শহর কলকাতাতেই প্রমাণিত। কলকাতার উত্তরভাগে এযুগেও অনেক বাড়িতে মেয়েরা 'ভাস্কর' দেখে মাথায় ঘোমটা দেয়, ফিসফিস করে কথা কয়, আর পুরুষের ভয়ে তটস্থ থাকে।

শহরের এপ্রান্তে এখনো পুরুষেরা মেয়েদের উপর হম্বিতম্বি করতে পিছপা হয় না, এবং লঘুজনেরা 'গুরুজন'দের ভয় করে। 'গুরুজন' শব্দটা বাতিল হয়ে যায়নি সেখানে।....

এসব বাড়িতে এখনো গিন্নীরা সারাদিন তসর পরে শুচিতা বাঁচিয়ে চলেন, এবং তাদের শুচিতার দাপটে বৌদের প্রাণান্ত হয়; ঝিয়েদের মাজা বাসন বৌ-মেয়েরা আবার মেজে ঘরে তুলবে, এটাকে গিন্নীরা ন্যায্য এবং অবশ্য করণীয় বলে মনে করে থাকেন। সেখানে এখনো গোবর এবং গঙ্গাজল সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, রান্নাঘরে মুরগীর প্রবেশাধিকার অকল্পনীয় কল্পনার মধ্যে ধূসরিত।

এই সস বাড়ির মেয়েরাও কলেজ যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা স্কুলের মেয়েদের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা পাচ্ছে না।

এক কথায় কলকাতার উত্তর অঞ্চলের বেশ কিছু অংশে এখনো বনেদী আইন কানুন ও সাবেকী চালচলন পুরোমাত্রায় বলবৎ।

এই সব পুরানো যুগে আটকে থাকা খানা-খন্দের কল্যাণে এখনো এখানকার রঙ্গমঞ্চে অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে সমৃদ্ধ পঞ্চমাঙ্কে পরিসমাপ্ত নাটক-

গুলির জয় জয়কার, 'একাঙ্কিকা' 'মুক্তাঙ্গন' 'একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ' এগুলি এই দর্শককুলের কাছে বালকের চাপল্য মাত্র।

কলকাতায় 'অনেক' হচ্ছে, কিন্তু কলকাতার অনেক না-হওয়ার দিনে যা ছিল, তার সবকিছুকে ঝেড়ে উড়িয়ে দেয়নি কলকাতা।

ও একহাতে 'এয়ার কণ্ডিশান্ড হেয়ার কাটিং সেলুন'কে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছে, অন্যহাতে পরম মমতায় 'পটলডাঙার মেস'কে ধরে রেখেছে। যার দরজায় উবু হয়ে বসে পিঠে খবরের কাগজ ঢেকে নাপিতের কাছে চুল ছাটেন বাবুরা।

পটলডাঙার মেস!

কলকাতার গভীরে গভীরে এখনো সেই 'পটলডাঙার মেস' তার উনবিংশ শতাব্দীর চেহারা নিয়ে দেদীপ্যমান। একশো বছর আগে নির্মিত সেই মেসবাড়ীতে বোধহয় নির্মাণের পর আর রাজমিস্ত্রীর প্রবেশাধিকার ঘটেনি।

'তস্য গলির মধ্যে অবস্থিত থাকার ফলে বাড়ীর বাইরের চেহারাটা অধিক বোঝা যায় না, কারণ সূর্যালোক এসে পড়ে তাকে প্রতিফলিত করবার সুযোগ পায় না।

ভিতরে নীচের তলায় দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়, রাঁধুনী ঠাকুর ডালে-ঝোলে 'হঠাৎ পড়ে যাওয়া' নেংটি ইঁদুর বা আরশোলাকে হাতায় করে তুলে ফেলে দিয়ে সেই ডাল-ঝোল পরিবেশন করতে দ্বিধাবোধ করে না।

সিঁড়ির অর্ধেক রেলিংই বহুপূর্বে স্থানচ্যুত, হাতলের লম্বা কাঠামোটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্বস্থানে রাখা হয়েছে।

জানালা-দরজার অবস্থাও অনেকক্ষেত্রেই তাই। কোনো পাল্লাটা লোহার তার দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, কোনো পাল্লা হয়তো একেবারে পেরেক পুঁতে এঁটে ফেলা হয়েছে। জন্মকালে তাদের হয়তো সবুজ রং ছিল, কিন্তু এখন পোড়া কয়লার রং ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

দেয়ালের রং কেমন একরকম লালচে খয়েরি হয়ে গেছে, এবং

তেলে তেলে পঙ্কের কাজ করার মত চকচকে হয়ে উঠেছে। সেইসঃ দেয়ালে দেয়ালজুড়ে যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর ব্যাপী ছারপোকা নিধনের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস আঁকা।

তারই পাশে পাশে মানুষের মুখের ব্রণ বা বসন্তের গর্তের মত অসংখ্য পেরেকের গর্ত। বহু মাপের মশারি এবং বহু সৌখিন ব্যক্তির ছবি ও ক্যালেণ্ডারের সাক্ষ্য বহন করছে।

এইসব গর্তগুলি ছারপোকাদের আবাসস্থল। পুত্র কলত্র নিয়ে তারা সারাদিন সেখানে জাবর কাটে, রাত হলে সদলবলে চরতে বেরোয়, মশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রক্তমোক্ষণের কাজ চালায়।

কিন্তু পটলডাঙার এই মেসের বিনোদবাবু তাদের স্বস্তিতে থাকতে দিতে নারাজ। তিনি সময় পেলেই দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে ওই গর্তের মুখে মুখে ধরে একটি নির্মল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন।

ঘরের পার্টনার নয়নবাবু রুক্ষ গলায় বলেন, 'ছুটির দুপুরে আপনার আর কাজ নেই বিনোদবাবু, এসব কী হচ্ছে? গন্ধে মাথা ধরিয়ে দিলেন যে—'

বিনোদবাবু ধীরে সুস্থে আর একটি কাঠি ধরিয়ে অন্য একটি গর্ত আক্রমণ করতে করতে বলেন, 'আমার আবার শত্রুকে শিয়রে রেখে ডিটেকটিভ্ গল্পের বই পড়া দেখলে মাথা ধরে ওঠে।'

নয়নবাবু একটি পায়ের উপর আর একটি পা রেখে আরাম করে শুয়ে বইটি পড়ছিলেন, এই কটাক্ষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বসে বলেন, 'সব সময় আপনি আমার কথা নিয়ে কথা কইতে আসেন কেন বলুন তো?'

বিনোদবাবু ফস্ করে আর একটি কাঠি জ্বালিয়ে বলেন, 'আপনার কাছে শিখেছি।'

'আপনি ছারপোকা পুড়িয়ে লোকের মাথা ধরিয়ে দেবেন, লোকে কিছু বলবে না?'

'না, বলবে না। কারণ ছারপোকা হচ্ছে মানবজাতির শত্রু, এবং শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে, অস্ত্রে অগ্নিতে জলে, যেভাবে হোক মেরে শেষ করাই হচ্ছে মানবিক ধর্ম।'

'চমৎকার! মানবিক ধর্মটা ভালোই শিখেছেন!' নয়নবাবু আবার শুয়ে পড়ে বলেন, 'ম্যানেজারকে বলে ঘরটা বদলের ব্যবস্থা না করি তো—

বইয়ে মনোযোগ দেন।

না করেন তো কি করবেন সেটা আর বলেন না।

বলেন না বোধ করি এই জন্যেই, গত সাত বছর ধরে ওই একই কথা বলে আসছেন বলে। গোড়ায় গোড়ায় বলে ফেলতেন—'না করি তো আমার নাম নয়ন গাঙ্গুলী নয়।' বলে ফেলতেন—'না করি তো আমি শিশির গাঙ্গুলীর ছেলেই নই।'

কিন্তু ঘর বদল করা হয়ে উঠতো না।

বিনোদবাবু পরে ওই প্রতিজ্ঞার ভাষা নিয়ে হাসাহাসি করতেন। ডেকে ডেকে বলতেন, 'ও মশাই কি বলে তা'হলে এবার থেকে ডাকবো আপনাকে? নয়নবাবু তো বলা চলবে না।···বলতেন, ও মশাই খামোকা বাপের নাম ধরে প্রতিজ্ঞা করতে বসবেন না, কথার ওজন রাখতে শিখুন।'

বিশ্রী ক্যাঁটকেটে আর বিঁধানো বিঁধানো কথা বিনোদবাবুর। আর সেই জন্যেই নয়নবাবুর ঘর বদলানোর উপায় নেই। কারণ মেসের আর কেউই বিনোদবাবুর 'রুমমেট' হতে রাজী না।

অতএব নয়নবাবু এই সাত বছর ধরে ক্রুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছেন আমি যদি ঘর বদলানোর ব্যবস্থা না করি তো—'

বিনোদবাবু আর নয়নবাবুর এই কলহ সারা মেসে একটি হাস্য-পরিহাসের ব্যাপার। অন্যেরা বলে থাকেন, 'প্রেম কলহ'। কারণ মাঝে মাঝে আবার দু'জনের দাবার ছক নিয়ে বসতেও দেখা যায়।

অবশ্য সে খেলাও পরিণামে কলহেই পর্যবসিত হয়। দু'জনে দু'জনকে 'জোচ্চর' বলেন, 'এঁড়ে' বলেন, 'ফেরেববাজ' বলেন। জীবনে যদি আর আপনার সঙ্গে খেলি তো—বলে একটা কটু শপথ করে সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হয়।

কিন্তু এই দুই মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বাদে কি মেসে আর সকলের সঙ্গেই সকলের সম্প্রীতি ?

সকালবেলার দৃশ্যটি দেখলে তো তা মনে হয় না।

সকালবেলা শেওলা পড়া একটুকরো উঠোনে ততোধিক শেওলা পড়া একটা চৌবাচ্চাকে ঘিরে যে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলে, সেটা আর যাই হোক সম্প্রীতির পরিচয় বহন করে না।

ওই উঠোনের টুকরোটুকুরই একপাশে ডাঁই করে এঁটে বাসন জড়ো করা থাকে, কাকেরা তার উচ্ছিষ্টাংশিষ্ট নিয়ে ছড়াছড়ি করে, মাঝে মাঝে চিংড়ি মাছের খোলা, ডিমের খোলা বা কাঁকড়ার খোলা ছিটকে এসে চৌবাচ্চার জলে পড়ে। কিন্তু সেটাকে কেউই মারাত্মক কিছু মনে করে না, মগ ডুবিয়ে জিনিসটাকে ফেলে দিয়ে সেই জলেই স্নান সারে।

কলতলা বা স্নানের ঘর মাত্র একটি, কাজেই ভোর থেকে লাইন দিলেও অফিসের আগে সকলের হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, 'অফিসের বাবু, প্রায় সকলেই। তা নইলে কি জন্যেই বা স্ত্রী-পুত্র ফেলে এখানে পড়ে থাকবে!

অবশ্য সকলের জীবনই ঠিক এক নয়। কারো কারো অন্য ধরণের কাজও আছে।

বসন্তবাবুর মেসে পড়ে থাকবার কথা নয়। রিষড়ায়ে তার বাড়ি আছে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে। অবস্থা খারাপ নয়, অনায়াসেই ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতে পারেন, কিন্তু তা' তিনি করেন না।

তিনি বলেন, 'এ বেশ আছি মশাই, কোনো ঝামেলায় থাকতে হয় না। শনিবার শনিবার বাড়ি যাই, মনে বেশ নবযুবক-নবযুবক

ভাব আসে, বাড়ীতে জামাই আদর জোটে, পাড়ার সবাই সমীহ করে, মন্দ কী ?

নীলরতন বাবুর অন্য ব্যাপার। বিপত্নীক ভদ্রলোক। মধ্য বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর হঠাৎ মা-ভাইয়ের সংসার থেকে কেটে পড়ে চলে এসেছেন এই পটলডাঙার মেসে।

এখানে এসে প্রতিনিয়ত 'বাড়ির' খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে এখানকার খাওয়া দাওয়ার তুলনা করে আক্ষেপ করেন, নিজেকেই নিজে, 'ঘর থাকতে বাবুই ভিজে' বলে ধিক্কার দেন, অথচ অন্ধকূপের মতো একটা ঘর আঁকড়ে পড়েও থাকেন।

যখনই উনি আক্ষেপ করেন বা আত্মধিক্কার শুরু করেন, এঁরা ওঁরা তাঁরা বলেন, চোরের ওপর রাগ করে, আর কতদিন মাটিতে ভাত খাবেন মশাই ? ঘরের ছেলে ঘরে যান। আপনার যখন এতো খারাপ থাকা খাওয়ার অভ্যেস নেই !'

নীলরতন বাবু তখন বলেন, নাঃ একবার যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে আর নয়।'

'কিন্তু আপনার মা রয়েছেন—'

আমার মা নয়, ভায়েদের মা! নীলরতনবাবু কঠোর গলায় বলেন, যার স্ত্রী নেই, তার কেউ নেই বুঝলেন ? তার মাও 'সৎমা।'

'এটা আপনি ঠিক বলেছেন না নীলুবাবু ! মায়েদের বরং বিপত্নীক ব ব্যাচিলার ছেলের ওপরই টান বেশী হয়।'

'না হয় না।' নীলরতনবাবু আরো রুক্ষ গলায় বলেন, 'ওসব হচ্ছে সেকালের কথা। সেকালে শাশুড়ীরা গিন্নী ছিল। একালে শাশুড়ীরা বৌ-দের ভয়ে জুজু! একটা অসহায় ছেলেকে বেশী টানতে গেলে বৌদের মুখনাড়া খেতে হবে না ? পায়ের তলার মাটি হারাতে হবে না ?'

'তা' আপনার মেয়েও তো আছে বলছেন।'

'মেয়ে'। নীলরতনবাবু স-তাচ্ছিল্যে বলেন, 'মেয়ের কথা বাদ

দিন। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে আবার কী ছাতা দিয়ে মাথা রাখতে আসবে? 'বাপ' বলে আলাদা করে একটু মিষ্টি হাতে করে আনবার হিম্মত নেই। এই কাকা-খুড়ির কাছে 'সুয়ো' থাকবেন বলে এক চ্যাঙারি খাবার এনে ওদের হাতেই ধরে দেন।....নাঃ, বৌ-মরা লোকের মেস্ই হচ্ছে বেস্ট্ জায়গা।

একজন কুটুস কামড় দেন, 'না' মানে—আপনার থাকা-খাওয়ার কষ্ট হয় বলেন, তাই—'

'বলি। কী করবো, রক্তমাংসের মানুষতো? না ব'লে পারি না ব'লেই ব'লে ফেলি। আর বলবো না।

ব'লে জোরে জোরে গায়ে তেল মাখতে থাকেন নীলরতনবাবু।

এইটি ওঁর একটি বিলাস্। গামছা পরে এক ঘণ্টা ধরে তেলটি ঘষা চাই।

গামছা অবশ্য প্রায় সকলেই পরেন।

সকালবেলা উঠোনে যেন গামছার বাজার বসে যায়।

সায়া ব্লাউজ পরা ঝি-টা এসে বাবুদের দিকে পিছন ফিরে বাসন মাজতে বসে।

নয়নবাবু চিরকালই মেসবাসী। এই পটলডাঙারই ধারে কাছে থাক খান।

পরিবার দেশে থাকে।

অনেক মেস বদল করেছেন জীবনে, তবে কোনোখানেই পাঁচ-সাত বছরের কম থাকেন নি। পুরো ঘরের ভাড়া দিতে চাইলেও পুরো একটা ঘর ছেড়ে দিতে কোনো মেস রাজী হয় না, কাজেই রুম-মেট সহ্য করতেই হয়। রুমমেটের সঙ্গে বনিয়ে চলা সম্ভব নয়। পাঁচ-সাত বছর ধরে সেই অমানুষিক কষ্টটা নয়নবাবু সহ্য করেন। তারপর একদিন ফাটাফাটি কাণ্ড করে চলে যান।

এর আগে বাদুড়বাগানের এক মেসে ছিলেন। ওঁর রুমমেট

বেহালা বাজানো শিখতে শুরু করায় তাঁর বেহালা আছড়ে ভেঙে দিয়ে, এবং তার খেসারৎ দিয়ে চলে এসেছেন।

নয়নবাবুকে দেখলে এমনিতে অমন রাগী বা দুর্দান্ত বলে মনে হয় না, কিন্তু লোকটা হচ্ছে হঠাৎ-রাগী—রগচটা। একবার যদি মনে করে তাকে কেউ অপমান করেছে, তা'হলেই হয়ে গেল! মাথার রক্ত আগুন হয়ে উঠলো তার।

অথচ কলকাতায় বাসা করে বৌ-ছেলে আনবার ক্ষমতা জীবনেও হল না।

বিনোদবাবুর ইতিহাস আলাদা।

তিনি হচ্ছেন মেস-প্রেমিক এবং একনিষ্ঠ প্রেমিক। পটলডাঙার এই মেসটিতেই তাঁর আটাশ বছর কাটলো। পটলডাঙার মেস আছে, অথচ বিনোদবাবু নেই, এটা যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বিনোদবাবুর সংসারে কে আছে তা কেউ জানে না। ছুটিতেও কখনো বাড়ি যান না, এবং ছুটিও বড় একটা নেন না। কাজ করেন প্রেসে, কাজেই ছুটির বহরও খুব বেশী নয়। বাড়ির কথা কেউ জিগ্যেস করলে দারুণ চটে ওঠেন।

কেউ বলে, ওঁর বৌ কুলত্যাগ করে চলে গেছে, তদবধি উনি সংসারছাড়া। কেউ বলে লোকটা আদৌ বিয়েই করেনি। কেউ কেউ বলে, 'হতাশ প্রেমিক'।

বিনোদবাবুকে দেখলে অবশ্য ওই শেষের কথাটার সামঞ্জস্য বিধান করা শক্ত, কিন্তু কার যে ভিতরে কী আছে কে বলতে পারে!

আরো অনেক রকম 'বাবু'ই আছেন এ মেসে—কলকাতায় বাসা করে থাকবার সঙ্গতির অভাবে, জায়া-জননীর খোলামেলা গ্রামের বাড়ি ত্যাগ করে কলকাতার পায়রার কোটরে এসে ঢোকবার ইচ্ছের অভাবে, ডেলি প্যাসেঞ্জারী করবার ক্ষমতার অভাবে।

তবে সকলেই প্রায় সংসারে পোড়-খাওয়া জীবনে বীতশ্রদ্ধ মধ্যবয়সী।

'যৌবন' বলতে এক সীতেশ বোস আছে, টিউশানীই যার একমাত্র পেশা। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করতে পেরে ওঠেনি নিতান্তই অবস্থার প্রতিকূলতায়। অবশ্য আশা এখনো পোষণ করে, কারণ চল্লিশ পার হয় নি তার এখনো। অন্ততঃ নিজে তাই বলে।

* * *

এই মেসে হঠাৎ একদিন এক আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটলো। এ আবির্ভাব এখানে শুধু আশ্চর্যই নয়, যেন অস্বস্তিকরও।

শিশুর মতো সরল মুখশ্রী, কিশোরীর মতো ভীরুভীরু চাহনি, কনককান্তি এই ছেলেটা এখানে কোথা থেকে এলো?

সতেরো-আঠারো বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও চোখে মুখে কোথাও ওর 'বয়েস লাগার' ছাপ পড়ে নি কেন? ছিল কোথায় ও? মায়ের কোলে?

তা সত্যিই তাই।

মায়ের কোলেও নয়, ঠাকুমার কোলে।

অল্প বয়সে মা-বাপ-মরা নাতিটাকে বুড়ি বুকে দিয়ে আগলে মানুষ করেছে. খেয়ে খেলিয়ে বেড়াতে দেয় নি, বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। আর কড়া নজর রেখেছে—ছেলে পড়ছে কিনা।

তিন তিন ছ' মাইল হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করছে ছেলেটা বর্ষার দিনে কাদা ভেঙে। সন্ধ্যেবেলা পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিয়েছে বুড়ি নাতির. তবু কোনদিন বলে নি' থাক্‌গে কাল আর গিয়ে কাজ নেই।'

বরং মাঝে মাঝেই বলেছে, তুই হয়তো ভাবিস্ ঠাকুমা বুড়ির প্রাণে মায়াদয়া নেই। তা' ভাব্, কিন্তু লোকে যেন না বলে, 'মা বাপ

নেই বলে ছেলেটা মানুষ হলো না।' আর তুইও দাদা ভবিষ্যত না ভাবিস, ঠাকুমা আমায় শুধু আদরই দিয়েছে। আমার হিত দেখেনি।'

ছেলেটাও তাই শৈশব থেকে জানতো তাকে মানুষ হতে হবে।

বর্ষায় একহাঁটু কাদা ঠেলে, গ্রীষ্মে একহাঁটু ধুলো উড়িয়ে, আর শীতে কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় বুক কাঁপিয়ে, দিনে ছ'মাইল হেঁটেছে আর ভেবেছে, মানুষ হবার পথে এগোচ্ছি।'

রাত্রে হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলতে উসকে উসকে চোখের ঘুম ছাড়িয়ে পড়া মুখস্থ করতে করতে ভেবেছে, 'মানুষ হবার সিঁড়ি গাঁথছি।'

ঝড় বৃষ্টির রাত্রে, যখন পুরনো ঘরের দেয়ালগুলো থরথরিয়ে উঠেছে, জানালা-দরজাগুলো ধাক্কা খাওয়ার মতো ঠকঠক শব্দ তুলেছে, ঠাকুমার কাছে ঘেঁসে শুয়ে মনে মনে ভেবেছে, মানুষ হয়ে সবার আগে এই বাড়িটা সুন্দর করে সারাবো।··ভেবেছে, বাড়িটা ঠাকুমার জন্যে উঁচু দালানে আলাদা করে একটা ঠাকুরঘর বানিয়ে দেব, ঠাকুমা সেই ঘরে সত্যনারায়ণ পূজোর ঘটা করবে, গ্রামসুদ্ধু সবাইকে শিন্নি বিলোবে আর আহ্লাদে ঠাকুমার মুখটা ঝকমক করবে। কারণ ওই আক্ষেপটাই বারবার ঠাকুমার মুখ থেকে শুনতে পেতো ছেলেটা, 'নারায়ণের হরির লুট দিয়ে ছ'খানা বাতাসা পেসাদও এখন আর দিয়ে উঠতে পারিনা কাউকে, অথচ এই বাড়ির এই উঠোনেই তোর ঠাকুদ্দার আমলে মানুষের মেলা বসে যেতো। তারা 'সত্যনারায়ণের কথা' শুনতো আর দু'হাত ভরে পেসাদ নিয়ে যেতো। কী দিনই গেছে, আর কী দিনই পড়েছে।'

মুখচোরা ছেলেটা বেশী কথা বলতো না, শুধু আস্তে বলতো, আবার তেমনি করে পূজো হবে ঠাকুমা—'

মনে মনে বলতো, দেখো হয় কিনা। মানুষ হয়ে উঠে প্রথম

কাজই হবে আমার, তোমার এই আক্ষেপ দূর করা।····শুধু পূজো কেন, গ্রামের সকলের বাড়িতে মুখে-ভাত, পৈতে, বিয়েতে ভাল করে কিছু দিতে পারে না বলে কতো দুঃখু করে ঠাকুমা। বলে— মনের মতন ক'রে লৌকিকতা করতে না পারলে মানুষের বাড়িতে যাবো কোন মুখে? আগে এ বাড়ি থেকেই গ্রামের সেরা লৌকিকতা যেতো।

ছেলেটা বলতো, 'আবার সব হবে, তুমি দেখো ঠাকুমা।

ঠাকুমা মনে মনে হাসতো, হয়তো বা ভাবতো—ছেলেটার বাইরেটাও যেমন শিশুর মতো, ভেতরটাও তেমনি। জানেনা তো পৃথিবীতে কত ধানে কত চাল।

ভাবতো, কিন্তু মুখে সে কথা বলতো না। মুখে উৎসাহ দিয়ে বলতো, সেই আশায় তো বুক বেঁধে পড়ে আছি দাদা।'

ছেলেটা তখন রাত জেগে ভাবতে বসতো, আর কিসে কিসে ঠাকুমার মুখ উজ্জ্বল করা যায়।····অনেক চিন্তা অনেক পরিকল্পনা।

মোটকথা ঠাকুমার মুখটা উজ্জ্বল করতে হবে।

কিন্তু ঠাকুমার মুখ উজ্জ্বল করার সময় আর পেল না বেচারা। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট বেরোয়নি, ফুট্ করে মরে গেলে বুড়ী।

ছেলেটার মনে হলো, ইহজীবনের সব কাজ তার শেষ হয়ে গেছে, রেজাল্ট আর না বেরোলেও ক্ষতি নেই। কার জন্যে কী!

পাড়ার পাঁচজনে ছেলেটাকে ধরে কয়ে বুড়ীর শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে দিল নমোনমো করে, এবং সৎপরামর্শ দিতে লাগলো—'জমিজমা যা আছে বেচে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে লেখা পড়া করগে। বুড়ির বড় সাধ ছিল তুই লেখাপড়া শিখবি, মানুষ হবি।

একজন জ্ঞাতি জ্যাঠা এ পরামর্শটা বেশী দিতে লাগলো, কারণ ওই ছেলেটার জমি তাঁরই জমির লাগোয়া।

পাড়ার এক পিসি দু'বেলা বেঁধে বেঁধে এনে, মুখ গুঁজে পড়ে

থাকা ছেলেটাকে তুলে তুলে খাওয়াচ্ছিল, সে চুপি চুপি বললো, 'শুনিসনি ওর কথা। নিজের স্বার্থে তোকে হিত উপদেশ দিতে এসেছে। বাপ-ঠাকুর্দার জমি বেচবি কেন? অত লেখাপড়ার দরকার কি? ওই জমি চাষ আবাদ কর, ওতেই সোনা ফলবে। নতুন খুড়ী তো স্বামীপুত্তুর মরেহেজে যাওয়ার পর ওই জমি থেকেই এ যাবৎকাল খরচ চালিয়েছে, তোর পড়া চালিয়েছে। ও জমি লক্ষ্মী।'

তারপর চুপি চুপি এ পরামর্শও দিয়েছে, 'দু' চারটে বছর কষ্ট করে চালিয়ে একটা ভাল দেখে মেয়ে বিয়ে করে ঘর গেরস্থী হ।' ওই জ্যেঠার নাকের ওপর নতুন দালান কর। মেয়ে আমি দেখবো।' কিন্তু পিসির কথা দাঁড়াল না।

দাঁড়াবার মতো কথাও নয়।

ঠাকুমার হাতে হাঁড়িকুড়ি নেড়ে নিজে রেঁধে খেয়ে, জমিতে সোনা ফলাবার এবং বিয়ে করে সংসার করবার স্বপ্নটা ছেলেটার দুঃস্বপ্ন মনে হলো।

অতিষ্ঠ হচ্ছিল প্রাণ, এখান থেকে ছুটে কোথাও চলে যাবার জন্যে মন ছটফট করছিল।

অতএব জ্যেঠার উপদেশই গ্রাহ্য হলো। জমিজমা হস্তান্তরের ব্যাপারে জ্যেঠা ভাইপোকে এতটুকুও আঁচ পেতে দিলেন না, সব হাঙ্গামা নিজে পোহালেন বাকি শুধু সইটা করা।

কোর্টে গিয়ে দুটো সই করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ছেলেটা। কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্নটা দেখতে লাগলো আবার। এখন মনে হলো, এভাবে হেলায় ফেলায় দিন কাটালে চলবে না। তাকে দাঁড়াতে হবে, মানুষ হতে হবে।

ঠাকুমা স্বর্গ থেকেও তা দেখবে!

জমি বেচার টাকার অঙ্কটা দেখে জ্যাঠার বাড়ির লোক বাদে অন্য সবাই ছি ছি করতে লাগলো। মা-বাপমরা অসহায়

ছেলেটাকে এভাবে ঠকিয়ে যে শেষ ভালো হবে না লোকটার, এমন অভিশাপও দিলো—যদিও জ্যেঠার আড়ালে। ছেলেটার কাছে কিন্তু তখন ওই হাজার আড়াই টাকাই রাজৈশ্বর্য। কলকাতায় একবার যেতে পারলে হয়।

'কিন্তু কেমন করে সম্ভব সেই যেতে পারাটা' ?

একজন কেউ হাত ধরে নিয়ে না গেলে যেতে পারবে, এমন ভাবে তো তৈরী হয়নি সে।

বাড়ি থেকে স্কুল, স্কুল থেকে বাড়ি, এই তো তার পৃথিবীর পরিধি।

*　　　*　　　*

পরীক্ষার ফল বেরোলো।

যদিও ছেলেটা উপন্যাসের নায়কদের মতো একেবারে 'ফার্স্ট হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল না, তবে প্রথম বিভাগটা পেল। অতএব কলকাতার কলেজ আর আকাশকুসুম রইল না।

শুধু যাওয়ার উপায় আবিষ্কার।

টিকিট কেটে রেলে চড়ে বসলেইতো কলকাতায় যাওয়া নয়, গিয়ে উঠবে কোথায় ? ভরসা কে ? কলেজে ভর্তি হবার উপায় বাৎলে দেবে কে ?

তা সব বিষয়েই জ্যেঠা অকূলে কাণ্ডারী হলেন। তিনিই বললেন, 'কিছু ভাবনা নেই তোর নিমু, সব ব্যবস্থা করেছি আমি। কলকাতায় একটা ভাল মেসে আমার খুড়তুতো শালা থাকে, মাস্টারী করেই খায়, সে অবশ্যই কলেজে ভর্তির সব তাকবাক জানে, সে তোর ভার নেবে। বে-থা করেনি, আইবুড়ো কার্ত্তিক, সময় অগাধ। তাকে সবিস্তারে তোর কথা লিখে জানিয়েছি। রাজী হয়েছে নিয়ে যেতে। সেই মেসেই থাকবি তুই। সে তোর লেখাপড়ার ভার নেবে।'

নিমাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জ্যেঠাকে তার দেবতা মনে হলো। আশ্চর্য। এই লোকের নামে নিন্দে করছে লোকে।

নিমুর জন্যে তলে তলে কত ভেবেছেন জ্যেঠা। কত ব্যবস্থা করেছেন। ঠাকুমা বেঁচে থাকতে ঐ জ্যেঠা যে তাঁর 'নতুন খুড়ি'কে জ্বালিয়ে খেয়েছেন, সে কথা মনে পড়ল না নিমাইয়ের। হয়তো ভাল মতো জানতোও না। ঠাকুমা নাতির সঙ্গে উচ্চ আদর্শ, আর তার মৃত মা-বাপের গুণপণা ছাড়া, আর বিশেষ কোন গল্প করতোও না।

অতএব জ্যেঠা দেবতা!

কলকাতার কলেজ তবে হাতের মুঠোয় চলে এলো!

জীবনে কলকাতা দেখেনি নিমাই, শুধু স্বপ্ন দেখেছে তার। সে স্বপ্ন ঠাকুমাই দেখিয়েছে। ঠাকুমা-নাতিতে জল্পনা কল্পনা করেছে, 'পাশ' দিয়ে নিমাই যখন কলকাতা যাবে, কোথায় থাকবে, কেমন করে যাবে, ঠাকুমা তখন কী করবে।

ঠাকুমা বলেছে, 'আমার জন্যে চিন্তা করিসনে দাদা, আমি এখান থেকে তোকে টাকাকড়ি পাঠাবো, তুই সেখানে মন ঠাণ্ডা করে পড়বি।'

নিমাই বলেছে, তোমার কাছ থেকে অতো দূরে চলে যাবো ঠাকুমা? তার চেয়ে বোলপুরে গিয়ে পড়লে হয় না?

ঠাকুমা বলেছে, 'না' ধন! সেই যখন বাড়ি ছাড়া হয়ে থাকতে হবে, তখন আর যেখানে-সেখানে কেন? কলকাতাই ভাল। কলকাতার কলেজের হোটেলে থাকবি। তার একটা মাজ্যিই আলাদা।

নিমাই হেসে উঠেছে। 'হোটেল নয় ঠাকুমা, হোস্টেল।'

'ওই হলো দাদা, একই কথা। পয়সা নিয়ে থাকতে দেয়, খেতে দেয়, তাকে আমরা হোটেলই বলি।

'কিন্তু কী দরকার? নিমাই বলতো, তোমায় ছেড়ে থাকতে হবে?, তোমায় ফেলে চলে যেতে হবে?'

ঠাকুমা ছি ছি করে উঠতো।

'বেটাছেলে' ঠাকুমার জন্যে মন কেমন করবে বলে জীবনের উন্নতি করবে না?

তা' ঠাকুমা তো সেই ঠাকুমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেলো নিমাইকে। নিজেই তাকে ফেলে চলে গেলো। সেই শোকে নিমাই ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্নের সমাধি রচনা করে নদীর ধারে খেয়াই মাঠে, ফাঁকা হাটতলায় ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আর চোখের জল চোখে শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। আবার নিমাই পুরোনো চিন্তায় এলো, আবার নিমাই লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখলো।

আর সে 'দেখা'র চোখটা পেলো এই জ্যেঠারই দয়ায়। তার ওপর আবার এই সুযোগ, নিজের আত্মীয়কে দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব।

নিমাইয়ের চোখে জল এলো।

ঠাকুমা মরা থেকে পরীক্ষার ফল বেরানো পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ তো পান্তা হয়েই রয়েছে।

অতএব এই নতুন আবেগে ভিজলো আবার।

সুখ দুঃখ দুইই তো আবেগের জনক।

জ্যেঠা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'আমার শালা' মানে তোর জ্যেঠির ভাই। তা সে তোর মামা-ই হলো। মা আর জ্যেঠিতে ভিন্ন নয়। অতি সজ্জন ছেলে, এলে দেখবি। মামা বলেই ডাকবি তাকে। আর আসা-যাওয়ার খরচা তোকে আর দিতে হবে না। আমিই দেব।'

বার্তা শুনে পাড়ার লোক আবার কান ভাঙাতে এলো নিমাই নামের ছেলেটার।

বললো, 'ঠকিয়ে সর্বস্ব লিখিয়ে নিয়ে শান্তি হল না, নিজের খরচায় লোক আনিয়ে তাকে ভিটেছাড়া করছে। ভগবান জানেন— সে লোক সত্যি তার জ্যেঠার শালা, না কোনো গুণ্ডা শালা।

অমন আভাসও দিল কেউ কেউ—'পয়সা দিয়ে গুণ্ডা আনাচ্ছে জ্যেঠা, নিমুকে ভুলিয়ে রেলে তুলে টাকাকড়ি সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে

মেরে কেটে কোথাও পাচার করে দিতে। ওর ঘরের টাকা ওরই ঘরে ফিরে আসবে, মাঝ থেকে তুই ভিটে ছাড়া হয়ে যাবি।'

কিন্তু নিমাইয়ের কলকাতা অভিমুখী মন এসব কুট-কচালে কথায় বিচলিত হয় না। নিমাই তার জ্যেঠার শালার আসার আশায় দিন গোনে।

*   *   *

সীতেশ বোসের অবশ্য ছুটির দিনের প্রশ্ন নেই, ছুটি নিলেই ছুটি। ছাত্রদের একবার জানানো—'কাল আর আসতে পারবো না।'

তার বদলে একটা রবিবার পড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি রেখেছে সীতেশ বোস। কাজেই ছাত্র খুঁৎ খুঁৎ করলেও ছাত্রের বাবা দু'কথা শোনানোর সুবিধে পান না।

রবিবারের সঙ্গে একটা শনিবার 'ইচ্ছে ছুটি' যোগ করে, সীতেশ বোস আগের রাত্রে জানান দিলো মেসে, 'কাল আমি যাচ্ছি তাহলে ম্যানেজারবাবু। পরশু বিকেলে ভাগ্নেকে নিয়ে ফিরবো।'

বললো, খেতে বসে। যাতে অনেকের কানে যায়।

ভিজে স্যাঁৎসেঁতে, সীমেণ্টের চটা উঠে উঠে গর্ত-হয়ে-যাওয়া খাবার ঘরের মেঝেয় টানা করে চ্যাটাইয়ের আসন পাতা, তার সামনে সারি সারি পেতলের থালা, এ্যালুমিনিয়মের বাটি।

তবে জলের গ্লাসটি অনেকেরই নিজস্ব। কেউ একটা পলকাটা মোটা কাঁচের গ্লাস, কেউ কলাইকরা গ্লাস হাতে করে নিয়ে এসে বসেন। কেউ কেউ 'নির্মল' জলও ভরে আনেন তাতে।

ওরই মধ্যে হয়তো কারো দিনের খাওয়ার একছিটে দই, রাতের খাওয়ায় একটি রসমুণ্ডি। হয়তো বা একা খাওয়ার লজ্জা ঢাকছে অথবা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, ডেকে ডেকে সবাইকে বলবেন তিনি, 'যাই বলুন তাই বলুন, 'হেল্‌থ'টা হচ্ছে সকলের আগে। 'হেল্‌থ' রক্ষার জন্যে খরচা কিছু করতেই হবে।'

মেসের যা চার্জ, তা'তে ভোজন পাত্রে 'বিশেষ, বস্তুর আবির্ভাব ঘটার আশা করা যায় না। তবু সেদিন হঠাৎ মাংসের আয়োজন হয়েছিল।

তাই অধীর আগ্রহে সকলে 'রুটি' আসার আশায় রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেই সময় সীতেশ বোস ওই অশনিপাতটি করে বসলো—

'কাল আমি যাচ্ছি তা'হলে ম্যানেজারবাবু, পরশু একেবারে ভাগ্নেকে নিয়ে ফিরবো।'

সীতেশ বোসের যে কোনো ভাগ্নে আছে, একথা কেউ কোনদিন শোনেনি। তার ওপর আবার সেই ভাগ্নেকে এনে এই মেসে তোলবার তাল! তাল কেন, ব্যবস্থা একেবারে পাকা।

অথচ মেসবাসী ভদ্রলোকেরা কেউ জানেন না সে খবর। কেবলমাত্র সীতেশ বোস আর ম্যানেজার রথীন মিত্তিরে জানাজানি।

তার মানে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

তার মানে কায়েতে কায়েতে গলাগলি।

সীতেশকে স্রেফ ধাপ্পাবাজ মনে হয় সকলের। যেন সকলকে ধাপ্পা দিয়ে ভয়ানক একটা সুযোগসুবিধে করে নিয়েছে সীতেশ বোস। তা সুবিধেও বটে। সীতেশ বোস একলা একটা ঘরে থাকে। যদিও তিনতলায় ছাতের সিঁড়ির ঘর, তবু একা তো বটে! কাজেই 'ডবল সিটেড্' রুমের আধখানার থেকে কিঞ্চিৎ বেশী ভাড়া তাকে দিতে হয়।

সেই বেশীটার জন্যে সীতেশ বোস ক্ষুব্ধ হলেও অন্যান্যরা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাকে। পুরো একটা নিজস্ব ঘর তো বটে!

সে ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

তা পড়ুক না।

দোতালায় কার ঘরেই বা বর্ষায় ছাদ দিয়ে জল না পড়ে? সীতেশের না হয় একটু বেশী পড়ে।

সারা বছর তো আর বর্ষা নয়!

জলের দরের ঘরে জল একটু সহ্য করে নিতে হয়।

কিন্তু এটা কী?

সেই জলের দরের ঘরে আবার পার্টনার জোটাচ্ছে লোকটা? তার মানে ওই জলের দরেরও অর্ধেক। অথচ আত্মীয় পার্টনার।

ভাগ্নে!

ভাগ্নে বলে কি ছেড়ে কইবে সীতেশ বোস? কানা কড়াটি অবধি গুনে নেবে না?

যাক্, তাও না হয় হলো।

সীতেশ যে কাউকে না জানিয়ে, শুধু ম্যানেজারের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে এতোবড়ো একটা ঘটনা ঘটাতে সাহস করেছে, এইটাই বড় বেশী দাগাদায়ক।

আজকের রান্নাঘরের রাজকীয় 'মেনু' ও যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায় এই অপমানে।

এটা ফার্স্ট ব্যাচ।

আর বিনোদবাবু বরাবরই ফার্স্ট ব্যাচের খদ্দের।

বিনোদবাবুই শুধু মেসের পেতলের গ্লাসে জল খান। বলেন, জন্ম গেল ওতেই, কই কখনো কোন জার্ম্ এসে শরীরে ঢুকছে? কলঙ্ক পেতলে থাকে না, থাকে মনে।'

নিষ্কলঙ্ক মনের গৌরবে চেয়ে চেয়ে তিন গ্লাশ জল খান বিনোদবাবু সেই কলঙ্কপড়া পেতলের গ্লাসে।

সেই বিনোদবাবু ভুরু কুঁচকে বলেন, 'ব্যাপারটা কী সীতেশবাবু?,

সীতেশ বোস তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'ব্যাপারের তো কিছু নেই। ভাগ্নে পাশ করেছে, কলকাতায় এসে পড়বে, তাই তাকে আনতে যাচ্ছি।'

বিনোদবাবু তাচ্ছিল্য গায়ে মাখেন না, আরো কুঞ্চিত ললাটে বলেন, 'ভাগ্নে মানে ?'

'ভাগ্নে মানে জানেন না ? মানে বোনের ছেলে।'

'সে মানে আপনার কাছে জানতে চাইনি সীতেশবাবু। মাস্টারী করে খান বলে ধরাকে সরা দেখবেন না। বলছি—ভাগ্নে এলো কোথা থেকে ? শুনিনি তো কখনো।'

'আমার কে কোথায় আছে, সমস্ত শুনেছেন আপনি ?'

তবু বিনোদবাবু হেলেন দোলেন না, বলেন—তা' বেশ, না হয় আপনার অনেক আত্মীয় আছে, আমাদের মতো অভাগা আপনি নন, কিন্তু একেবারে এনে ফেলবার আগে আমাদের তো কই জানালেনও না।'

সীতেশ বোস রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, প্রত্যেকটি ব্যাপার প্রত্যেককে জানাতে হবে, এমন আইন আছে সেটা তো জানা ছিল না।'

'তা হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে এই মেসে নিয়ে আসবেন—বাচ্চা ছেলেই বলবো, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে বলেছেন—'

'ম্যাট্রিক নয়, হায়ার সেকেণ্ডারী—'

'ও একই কথা। মোট কথা ছেলে, বাচ্চা মাত্তর। তাকে আপনি এখানে—'

'তাতে আপনাদের অসুবিধে কি ?'

আমাদের অসুবিধের কথা হচ্ছে না—' বিনোদবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, তার অসুবিধেটাই চিন্তা করছি। এখানে সর্বদাই মনোমালিন্য, অসম্প্রীতি, রাগারাগি, চেঁচামেচি—নয়নবাবুর প্রতি কটাক্ষ করে কথা শেষ করেন।

'ও নিয়ে আর আপনি মাথা ঘামাবেন না,—বলে সীতেশ বোস খাওয়া সেরে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সীতেশ বোস পেটরোগা ধাতের। তিনখানার বেশী রুটি খায় না, অতএব খেতে তার সময় কম লাগে।

সীতেশ বোস উঠে যেতে সমালোচনার স্রোত উদ্দাম হয়। বিনোদবাবুর মতো সবাই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নয়, তাই এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে নি, এখন বলতে থাকে।

এই পরিবেশে একটা সদ্য স্কুল থেকে ছাড়া পাওয়া ছেলেকে আনা কেউই অনুমোদন করে না।

এমন কি নীলরতনবাবু মেসের বাসনমাজা ঝি-টার বয়সের উল্লেখ করেও মাথা নাড়েন।

আসল কথা, সকলেই বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে কথা বলেন।।

সীতেশ বোস যে বেশ একটা 'দাঁও' বাগিয়েছে, এইরকম একটা সন্দেহেই বিরূপতাটা এতো বেশী।

নির্ঘাত নিজের বোনের কাছ থেকে প্রাইভেট টিউটারের মাইনেটা মারবে, তাছাড়া ওই ঘরের ভাড়াও।

ভাগ্নে যখন, তখন একটু পৃষ্ঠবলও বাড়বে।

এই মেসে কারুরই আত্মীয় বলতে কেউ নেই।

একেই তো সীতেশবাবুর 'বয়েস'টাই অনেকের গাত্রদাহের কারণ ছিল, এখন আরো বাড়লো সে দাহ।

তবু কেউ ভাবতেও পারেনি এমন একটা ভাগ্নে সম্পদের অধিকারী ছিল সীতেশবাবু।

এ হেন আবির্ভাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

এ আবির্ভাব আশ্চর্য তো বটেই, রীতিমতো অস্বস্তিকর।

শিশুর মতো সরল মুখশ্রী, কিশোরীর মতো ভীরু ভীরু চাহনি, কনককান্তি এই ছেলেটা সীতেশ বোসের কোন ভাঁড়ারে ছিল?

নিমাইয়ের বাবাও ছিল এমনি রূপবান। তাই নাম ছিল ফটিক-চাঁদ। নিমাইয়ের সে গোরাচাঁদ নাম রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ঠাকুরমার নাম গৌরীবালা, নিমায়ের মা বলেছিলেন, 'ছেলের ওই নাম রাখলে আমি ডাকবো কি করে? মার নাম এসে যাবে না?

তা মায়ের ডাকাডাকির প্রশ্ন শৈশবেই খতম হয়ে গেল। নিমাইয়ের নামটাই শুধু গোরাচাঁদ না হয়েই নিমাইচাঁদ হলো।

পাড়ার লোক বলতো, 'সোনার গৌরাঙ্গ'।

মেসে সবাই বললো, 'সোনার কার্ত্তিক'।

'এই সোনার কার্ত্তিকটি, ওই সীতেশ বোসের ভাগ্নে।'

নয়নবাবু অনেক ডিটেকটিভ গল্প পড়েন, তাঁর চট করে 'ছদ্মবেশ' শব্দটা মাথায় এসে যায়! তাই গলা নামিয়ে বলেন, 'দেখুন আসলে ভাগ্নে না আর কিছু। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে।'

'সন্দেহ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন বলুন তো?

'কেন আবার! ভাবভঙ্গী দেখেছেন?,

'কিন্তু গোঁফের রেখা রয়েছে।'

'সে অমন অনেক মেয়েরও থাকে।"

নয়নবাবু গলা আরও নামিয়ে বলেন, 'ফল্স্ রেখা' কিনা তাই বা কে বলতে পারে? আজকাল নকল ভুরু, নকল সোনা অনেক কিছুই মেলে, নকল গোঁফের রেখাই বা না মিলবে কেন? দিব্যি তো তিন-তলায় নিজের ঘরে পুরে ফেললেন।'

অনেকেই অবশ্য এতটা অবিশ্বাস বা এতটা সন্দেহ করলেন না, কিন্তু কেউ কেউ রীতিমত মাথা ঘামাতে লাগলেন পরীক্ষার উপায়টা কী তাই ভেবে।

যাকে নিয়ে এতটা মাথা ঘামানো, সে এসবের কিছুই জানে না। সাতসকালে জ্ঞাতি পিসির বাড়ী থেকে ভাত খেয়ে অজানা অচেনা এক পাতানো মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল চিরচেনা জগৎ থেকে যেন আচ্ছন্নের মতো।

'এই গ্রামে তার যা কিছু ছিল, তার কিছুই আর রইল না।

আবার কোনদিন এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হলে, অন্যের উঠোনে এসে দাঁড়াতে হবে,—পিসির বুঝিয়ে দেওয়া এসব কথা ভাবছিল না নিমাই, তার শুধু মনে হচ্ছিল, ঠাকুমা এখানে ছিল। মরে গিয়েও কোথায় যেন ছিল, নিমাই তাকে ফেলে রেখে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে।

গ্রামের চেনা পথটি যখন চোখ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তখন হঠাৎ নিমাইয়ের মনে হলো, জ্যেঠামশাই তার বন্ধু না শত্রু ?

এতগুলো লোক এতদিন ধরে তো তাই বুঝিয়েছিলেন নিমাইকে। নিমাই কেন বোঝেনি ?

সত্যিই যদি এই লোকটা জ্যেঠার শালা না হয়ে গুণ্ডা হয় ? সত্যি যদি মেরে কেটে—

আবার মনকে সামলে নিল নিমাই। তাই কি সম্ভব ?

সীতেশ মামা কতো লেখাপড়া জানেন, নিমাইকে কতো প্রশ্ন করলেন পড়ালেখার ব্যাপারে, গুণ্ডা কি পারে এসব ?

তবু বারেবারেই চোখের সামনেটা যেন শুধু অন্ধকার লাগছে।

কে জানে কেমন সেই কলকাতা !

কলকাতায় যখন এসে নামলো, তখন হাওড়া স্টেশন আলোর মালা পরে সেজে বসেছে।

জীবনে নিমাই এত আলো কখনো দেখেনি।

নিমাইয়ের চোখ ধেঁধে গেল। সে অজ্ঞাত সারে সীতেশের হাত চেপে ধরলো।

তা সীতেশ বোস সেটাকে অস্বস্তিকর মনে করে ঝেড়ে ফেলে দিল না, বরং যেন পরম যত্নে আরো মুঠিয়ে ধরলো। বললো, 'ভয় কি ? এসো আমার সঙ্গে।'

নিমাই অতএব আশ্রয় পেলো।

হাওড়া থেকে পটলডাঙ্গার মেসে আসতে, আগে বাস তারপর রিকশা।

নিমাইয়ের ছোট ট্রাঙ্ক আর ক্ষীণকায় বিছানাটা বাসড্রাইভার কিছুতেই নিতে চাইছিল না। অনেক খোসামদ করে, অনেক বকাবকি করে ডবল ভাড়া দিয়ে রাজী করালো তাকে সীতেশ মামা। নিমাই বিহ্বলদৃষ্টিতে দেখলো সেই বাহাদুরি।

তারপর কোথা দিয়ে না কোথা দিয়ে ঘুরিয়ে তিন চারটে পাক খেয়ে কোন একটা গলিতে ঢুকে পড়লো রিকশাটা। তারপর সেও বকাবকি শুরু করলো—আর যাবে না।

আর ঢুকবে না রিকশা।

'তবে চলো নিমাই, এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যাক।'

বলে সীতেশমামা নিজেই নিমাইয়ের ট্রাঙ্কটা বাগিয়ে ধরে বিছানাটা নিমাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এগোতে লাগলো গাইড হয়ে।

গলির বাঁকের মুখে একটা লাইট পোস্ট! তেরছাভাবে খানিকটা আলো পড়েছে কোণের দিকে, বাকি সবটাই ছায়া ছায়া অন্ধকার। তবু পায়ের নীচেটায় যা দেখতে পাচ্ছিল নিমাই, তাতে তার সমস্ত অণু-পরমাণু সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল।

গ্রামের ছেলে সে, জড়োকরা জঞ্জাল দেখার অভ্যেস তার নেই তা' নয়, কিন্তু সে তো 'ওঁচলা-ফেলা পগার'। তার ধারে কাছে যাওয়ার আইন ছিল না। গিন্নীরা দেখতে পেলেই চান করিয়ে ছাড়তেন!

কিন্তু এই সংকীর্ণ গলির মধ্যে সেই কদর্য জঞ্জাল এমনভাবে ছড়ানো যে, মাড়ানো ছাড়া উপায় নেই!

নিমাই তো যতদূর সম্ভব সাবধানে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সীতেশ মামা তো ওইগুলো দিব্যি মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছেন।

কলকাতার প্রথম অনুভূতির অভিজ্ঞতা হাওড়া ষ্টেশনের তীব্র প্রখর আলো, দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা পটলডাঙার গলি—ডাস্টবীন-ওল্টানো।

সেই গলি পার হয়ে যে বাড়ির মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে আনলো সীতেশমামা, তাকে ঠিক 'বাড়ি' বলে বুঝতেই পারেনি নিমাই।

কোনখান দিয়ে ঢুকলো, কোন দৃশ্য অতিক্রম করে ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে তিনতলায় গিয়ে পৌঁছালো, তা টেরই পেল না। বোধকরি সেই যে আচ্ছন্ন হওয়াটা, সেটার ঘোর তখনো কাটেনি নিমাইয়ের।

পিসি সঙ্গে কিছু খাবার দিয়েছিল, সেটাই রাত্রির আহারে লাগলো। কারণ আজ আর মেস-এ নিমাইয়ের খাবার ব্যবস্থা হয়নি। সীতেশ বোস ম্যানেজারের সঙ্গে কিছুটা বকাবকি করে এসে বললো 'ঠিক আছে, তুমি আজকের মতো ওই খাবার টাবার খেয়েই কাটাও, কাল থেকে দেখছি।"

নিমাই তার কৌটো খুলে সসঙ্কোচে বলে, 'অনেক তো রয়েছে, আপনি কিছু নিন—'

সীতেশ একটু লুব্ধ দৃষ্টিপাত করেই পেটে হাত বুলিয়ে বলে, 'নাঃ! ওই চালের গুঁড়ির মালপোয়া আমার পেটে সহ্য হবে না। তুমি ছেলেমানুষ, তুমিই খাও।'

তারপর নিজের চৌকীর সামনে মাটিতে নিমাইয়ের বিছানাটা পাতিয়ে আদরের সঙ্গে তার হাত ধরে শুইয়ে বলে, 'শোও' এইখানে শোও। গায়ের জামা খুলে ফেলো। এই জানালা খুলে দিচ্ছি, গরম হবে না। আমি খেয়ে আসি। ভয় করবে না তো?

'ভয় করবে' একথা বলার মতো লজ্জা আর নেই, বিশেষ করে এই বয়সের ছেলেরা। নিমাই বললো, 'ধ্যেৎ!'

সীতেশ আর একবার তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

নিমাইয়ের ডাক ছেড়ে কান্না পচ্ছিল, তবু নিমাই এই নিতান্ত পর সন্তপরিচিত মানুষটার স্নেহস্পর্শে আশ্বাস পেল।

অস্বস্তিকর পরিবেশ, কেমন একটা গুমোট গুমোট গন্ধ, ঘুম আসতে চায় না, তবু কখন একসময় ঘুমিয়েও পড়লো।

কখন যে সীতেশ মামা এলো, টেরও পেল না নিমাই।

সীতেশ বোসের নির্দিষ্ট কোন চাকরী নেই, টিউশনিই সম্বল। তাই অন্ধকার থাকতে উঠে গরু চরাতে বেরোতে হয় তাকে।

একটা ছেলে আটটায় স্কুলে যায়। তাকে ছটার সময় পড়াতে যেতে হয়। অতএব এই রাজপুত্তুর তুল্য ভাগ্নেটিকে অনাথের মতো ভূমিশয্যায় ফেলে রেখেই চলে যেতে হয়েছে সীতেশ বোসকে। তাকে কোন নির্দেশ দিয়ে যাবার সময় পায়নি।

হয়তো ভেবেছে ওখান থেকে মানিকতলার ছেলেটার কাছে না গিয়ে আবার ফিরে মেসেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ হয়তো ঘুমোবেই ছেলেটা।

কিন্তু ততক্ষণ ঘুমোয়নি নিমাই।

খানিক পরে ঘুম ভেঙে গেছে তার।

প্রথমটা হকচকিয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়লো। উঠে পড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

নেমে এসে দোতালার বারান্দা।

অথবা সিঁড়ি থেকে ঘরে ঘরে পৌঁছবার প্যাসেজ।

তার-বাঁধা নড়বড়ে রেলিং, সেই রেলিংয়ের ধারেই এসে দাঁড়াল নিমাই। নীচের দিকে তাকালো। আর যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

এ কী দৃশ্য!

এ কোন ধরনের জায়গা!

ঠিক নীচেটায় খানিকটা জায়গা (গ্রামের ছেলে ওই শানবাঁধানো চাতালটুকুকে 'উঠোন' বলে ভাবতে পারে না), সেইখানে একদল কর্তা কর্তা লোক গামছা পরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা শুধু দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বা গায়ে তেল ঘসছে।

গামছার মাপ কারো বা আজানুলম্বিত, কারো বা জানুর অনেক ঊর্দ্ধে। যেন নিতান্তই লজ্জা নিবারণের দাঁতখিঁচুনি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিমাই।

কোথায় ছিল এতগুলো লোক!

কই, কাল তো কাউকে দেখতে পায়নি। না কি কোনোখান থেকে এসেছে সকালে! কিন্তু এসেছে যদি তো গামছা পরে এসেছে কেন?

আর এতো কথাই বা কইছে কেন?

নিমাই ওদের কথাগুলো শুনতে পায়, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শুধু তার কানে কথার এক-একটা টুকরো এসে ঢোকে।

'চৌবাচ্চা আপনার কেনা নয় মশাই। প্রতিদিনই বা আপনি আগে এসে হানা দেবেন কেন?'

'কেন? রাত চারটেয় উঠি বলে। একটু শান্তি করে চান করবো বলেই উঠি।'

'তা'হলে রাত্রেই একেবারে চান করে নিয়ে গিয়ে শোবেন। এভাবে ইয়ে করলে—'

'মুখুয্যে মশাই, গামছাটা একটু বড় দেখে কিনবেন। এখানে একটা মেয়ে ছেলে কাজ করে সেটা মনে রাখবেন।'

'নিজের চরকায় তেল দিন নীলুবাবু! আপনি কিভাবে তেল মাখেন সেটা ভেবে দেখেছেন?

'সকালবেলা থেকে তুচ্ছ কথা নিয়ে ফাটাফাটি করবেন না দাদা, একেই তো দেশে সমস্যার অন্ত নেই।'

'ওঃ দেশ নিয়ে কতো—চিন্তা!"

'আপনার না থাকতে পারে। মানুষ মাত্রেরই আছে। এই যে ইলেক্শান! আসছে—'

'ইলেকশান! রাবিশ! ভেতরে শুধু জোচ্চুরীর লীলা খেলা। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।'

'হবে শেষ পর্যন্ত একটা গণবিপ্লব।'

'এদেশে? হুঁ!'

'কালকের মাছটা কি রকম ছিল দেখেছিলেন নয়নবাবু? মুখে করা গেল না। স্রেফ্ পচা।'

'এবারের চার্জ কার হাতে তা' জানেন তো?'

'নাঃ, এখানে আর বেশীদিন বাস করা চলছে না।'

'চলছে না চলছে না বলেই তো পাঁচ বছর কাটালেন।'

'নিজের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন বসন্তবাবু। নেহাৎ নিরুপায় বলেই—'

'হয়েছে হয়েছে, আর জল ঢালবেন না। সবাই পয়সা দিয়ে থাকি, কেউ অমনি নয়।'

লোকগুলিকে পুরু সাবানের ফেনায় কেমন সাদা লোমওয়ালা জানোয়ারের মত দেখায়।

বিশ্রী একটা শ্যাওলা-শ্যাওলা আর টকটক গন্ধ পাচ্ছিল নিমাই। নীচের ঐ চাতালটা থেকে উঠে এসে যেন নিমাইয়ের গলার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

কিসের গন্ধ?

নিমাই ওই কুদৃশ্য আর কটু গন্ধ থেকে ঈষৎ সরে এসেছিল। হঠাৎ ভাঙ্গা খনখনে একটা মেয়েগলা শুনতে পেলো,—'একটু গা মেরে হাঁটুন না বাবু! একটা মেয়েছেলে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না? আমারও যেমন মরণ, তাই এই রাবণের গুষ্টির বাসদ মাজতে আসি। ফুরোয় আর না। ভদ্দরলোক আপনারা—একটু জ্ঞান নেই?'

নিমাই আবার সরে আসে।

নিমাই অবাক হয়ে দেখে একটা মেয়েমানুষ ওই শ্যাওলাধরা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে যেন নাচছে। চেহারাটা ঠিক আগুনের মতো।

নিমাই ওই বিরাট গামছা বাহিনীর মধ্যে সতীশ মামাকে দেখতে পায় না। নিমাই ভাবে, ছিঃ উনি কেন ওরকম হবেন?

ওরা নিশ্চয় আলাদা লোক।

কিন্তু ওরা কে?

নিমাই হতাশ হয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে। যে সিঁড়িটা জীবনে কখনো ঝাঁটা খেয়েছে বলে মনে হয় না।

ওরা যে কে, তা একটু পরেই টের পেল নিমাই। একে একে উঠে আসতে থাকেন ওই গামছা বাহিনী দোতালায়।

হাতে সাবানদানী, মাজনের কৌটা।

তার মানে ওঁরা এখানকারই বাসিন্দা।

দু একজন নিজমনে চলে গেলেন, একজন দাঁড়িয়ে পড়েন।

অবাক গলায় বলেন, 'কে?'

নিমাই কি বলবে ভেবে পায় না। শুধু দাঁড়িয়ে ওঠে। ভদ্রলোক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, 'কি হে তুমিই কি সীতেশ বাবুর ভাগ্নে নাকি?'

সীতেশবাবু!

নিমাই যেন এতক্ষণে পায়ের তলায় মাটি পায়। তাহলে কালকের ঘটনাটা সব ভৌতিক নয়। সীতেশবাবু নামের লোকটা এখানেই বাস করে।

নিমাই আস্তে বলে—'হ্যাঁ।'

'কি রকম ভাগ্নে?'

নিমাই চুপ করে থাকে।

ভেবে পায় না কি রকম ভাগ্নে বলবে।

ব্যক্তিটি ঘুঘু।

তাই নিমেষে বলেন, ও গ্রাম সম্পর্কে পাতানো মামা বুঝি?'

নিমাই তথাপি চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়।

এ প্রশ্নেরই বা উত্তর কী দেবে?

ভদ্রলোক গামছা অংগে শুকিয়েই প্রশ্ন করে চলেন, 'মা-বাপ আছে?

·······নেই ? কোথায় ছিলে ? ওঃ।·······সেখানেই পাশ করেছ ? হাইস্কুল ছিল ? তা কোন কলেজে ভর্তি হবে ?'

ইত্যবসরে একজন-দু'জন করে জমে যান অনেকেই ; কেউ শুকনো লুংগি পরে ঘর থেকে বেরোন, কেউ বা সেই স্নানের পোশাকেই।

কে ?

কে ?

সীতেশবাবুর ভাগ্নে ?

একেবারে যা দেখছি !

এখানে থাকা ঠিক বলে মনে হয় না। হোস্টেলই ভালো।

পড়ারখরচ বাড়ি থেকে পাঠাবে—? না সীতেশবাবুই ?

শক্ত প্রশ্ন।

অস্ফুটে আরো কথা শুনতে পায় নিমাই।

মা বোধ হয় রূপসী ছিল।

'দেখো ভাগ্নে না ভাগ্নী।'

'হেঁ হেঁ হেঁ।'

নিমাইয়ের কান লাল হয়ে ওঠে।

জল না দেওয়া বাসি মুখের ভিতরটা আরো বিস্বাদ হয়ে ওঠে নিমাইয়ের।

নিমাইয়ের আবার তার জ্যেঠাকে শত্রু বলে মনে হল। সন্দেহ হয় সীতেশ নামের লোকটাকে।

তবু টের পায় না—'সে সত্যি ছেলে না মেয়ে' এই নিয়ে তখন তুমুল আলোচনা চলছে ঘরে ঘরে।

নিমাই চারিদিক তাকিয়ে দেখে !

কী শ্রীহীন, কি বিশ্রী, কি বিবর্ণ !

এ-ই কলকাতার ভাল মেস !

খানিক পরে সীতেশ আসে।

অবাক হয়ে বলে, 'এ কী তুমি এখানে বসে আছো ? মুখটুখ

খোওনি ? কী আশ্চর্য। ওই তো কলতলা দেখা যাচ্ছে নেমে যাবে তো।'

তারপর আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন জানতে পারে নিমাইয়ের সঙ্গে না আছে সাবান, না আছে মাজন, একখানি গামছাই মাত্র স্নানসমুদ্রের ভেলা তখন হতাশ গলায় বলে—'নাঃ, আজই তোমায় নিয়ে দোকানে বেরোতে হবে। কলকাতায় ওসব ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজেনা কেউ, তেল মেখে স্নান করে না। এহলো সভ্য জায়গা। টাকা তোমায় কিছু খসাতে হবে বাপু।'

নিমাই নীচের ওই উঠোনটার দিকে তাকিয়ে বোধকরি 'সভ্য' শব্দটার অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। কারণ তখন সেখানেও এক গা সাবান মেখে কোন একজন উচ্চস্বরে স্তোত্র পাঠ করতে করতে মগ মগ জল ঢালছেন মাথায়, আর ঝিটা প্রবল স্রোতে ছাইমাটি দিয়ে পোড়া কড়া মাজছে।

কিন্তু সীতেশ মাষ্টার ভার নিয়েছে গ্রামের এই অসভ্য ছেলেটাকে সভ্য করবার। তাই সীতেশ মাষ্টার বলে, 'টাকা কোথায় তোমার ? সঙ্গে ?'

'ট্রাঙ্কে।'

'কত টাকা ?'........

'সর্বনাশ !' সীতেশ নিজের মুখটাতেই হাত চাপা দিয়ে বলে—'চুপ চুপ, খবরদার ! কেউ যেন না টের পায়। আজই পোস্ট অফিসে কিছু জমা দিয়ে আসি। তবে কিছু লেগে যাবে কলেজে ভর্তিতে, কিছু তোমার জামাকাপড় জিনিসপত্রে। কলকাতায় অমন হাভাতে ভাবে থাকলে তো চলে না। তা'ছাড়া তুমি ভাল কলেজে পড়বে।'

নিমাই আবার কৃতজ্ঞতা অনুভব করে।

তবু নিমাই আস্তে বলে, 'কলেজ হোস্টেলে থাকার খরচ কি খুব বেশী ?'

সীতেশ মাস্টার চোখ কপালে তোলে। 'তা' আবার বলতে!

বড়লোক ছাড়া আর পারে না। তাছাড়া দেখো এখন কলেজেই সিট্ পাও কি না, তা আবার হোস্টেলে!'

নিমাই জানতে পারে, কলেজের সিট্ দুর্লভ।

নিমাই জানতে পারে হোস্টেলে বড়লোকদের ছেলেরা ব্যতীত থাকতে পারে না।

কিন্তু নিমাই আরো অনেক কিছুও খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারে না কি?

নিমাইয়ের জিনিসের সঙ্গে সীতেশ মাস্টারেরও নানাবিধ জিনিস কেনা হয়ে যায়। অথচ সীতেশ মাস্টার নিজের পকেটে হাত দেয় না।

গত কালকের বাসভাড়া এবং রিকশাভাড়াটাও যে নিমাইয়েরই দেয়া ছিল, সেটাও জানতে পারে নিমাই আজ।

কিন্তু জানার পরিধি কি ওই খানেই থেমে যাবে নিমাইয়ের?

নিমাই কি জানছে না, কলেজে ভর্তি হওয়া মানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেড়ানো?

'শেষপর্যন্ত ঘুষ ছাড়া গতি নেই।' জ্ঞান দেন সীতেশ মামা। 'এ যে কী ভয়ানক জায়গা!'

ঘুষ বাবদ টাকা চেয়ে নেন সীতেশ মামা তাঁর আদরের ভাগ্নের কাছে। যে ভাগ্নের মামা আদরটা মাঝে মাঝে বেশ বিসদৃশ লাগে।

ঘুষটা আসলে কোন পকেটে ওঠে জানতে পারে না নিমাই। শুধু একদিন ধন্য হয়ে দেখতে পায় যে নিমাইচাঁদ মিত্র নামের ছেলেটা কলেজের ছাত্র হয়ে গেছে।

'নিমাইচাঁদ!'

সীতেশ মাস্টার বলেছিল, ওসব চাঁদ ফাঁদ চলবে না বাপু এখানে, কলকাতার লোক নামের ল্যাজাট্যা বাদ দিয়ে ফেলে।

কিন্তু সুবিধে হল না।

পরীক্ষার সার্টিফিকেটে যে 'চাঁদ' জ্বলজ্বল করছে।

অতএব নিমাইচাঁদ।

'তা' বলে কেউ নাম জিগ্যেস করেলে যেন ওই চাঁদটা বোলোনা, বুঝলে?

দীক্ষা দেয় সীতেশ মাষ্টার।

কলকাতার মন্ত্রে দীক্ষা।

সীতেশ মাষ্টারের প্রতি কেউ সদয় নয়।

কিন্তু সীতেশ মাষ্টারের ভাগ্নের প্রতি সদয়তার শেষ নেই কারোর।

সবাই ডাক দেন 'এই যে নিমাই' এসোনা এঘরে।'

নিমাই সঙ্কুচিত ভাবে ঢোকে। এবং তাদের কৌতুহল প্রশ্নের উত্তরগুলোও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়েই দেয়।

ভেবে পায় না, নিমাইয়ের অতীত জীবনের খবরে তাদের কী দরকার! সীতেশ মাষ্টার নিমাইয়ের সঙ্গে সত্যি মামাজনোচিত ব্যবহার করে কি না, তা জেনে কী দরকার। নিমাইয়ের টাকার ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেলে কি করে চলবে, তা জেনে কি দরকার।

কিন্তু মনে হয় জানাটা ওদের ভয়ংকর দরকার।

নিমাই তো জানাতে জানাতে হাঁপিয়ে উঠছে।

আর জানতে জানতেও।

পটলডাঙার মেসে-এর বাইরের ঝকঝকে কলকাতাকে দেখে আসছে, দেখে আসছে আলোর মালা পরা রাস্তা, আলো-পিছলে পড়া গাড়ীর সমারোহ, দোকানের হরিলুঠ, জিনিসের হরিলুঠ।

তারপর জানছে নিমাইয়ের জন্যে বরাদ্দ একটা চারভাঁজে ভাঁজ করা অন্ধকার গলি, আর এই শ্রীহীন বিবর্ণ মেসবাড়ির ছাতের ওপরকার হাত পাঁচ-ছয় একটা ঘরের অর্ধাংশ।

কিন্তু সেই অর্ধাংশটুকুই কি নিশ্চিন্ত শান্তির ?

নিমাই জানে না।

নিমাই বুঝতে পারে না।

নিমাই জীবনে কখনো মামার বাড়ি দেখেনি। 'মামার আদর' কাকে বলে জানে না, তাই নিমাইয়ের রাত্রি আসবার উদ্দেশ্যেই কেমন গা ছমছম করে।

ধীরে ধীরে আলাপও হচ্ছে সকলের সঙ্গে।

নাম জেনে ফেলেছে অনেকেরই।

বিনোদবাবু, বসন্তবাবু, নয়নবাবু, নীলরতনবাবু, মুখুর্য্যে মশাই, ঘোষ মশাই—এক-এক জন এক-এক রকম।

বিনোদবাবু বললেন, 'তোমাদের ঘরে ছারপোকার গর্ত নেই ? চলো না ধ্বংস করে দিয়ে আসি। ভয় নেই তোমাদের দেশলাই কাঠি খরচ করবো না। দেশলাই নিয়েই যাবো।'

নয়নবাবুবললেন 'ডিটেকটিভ গল্প পড় না ? বল কি হে ? ইয়ংম্যান তুমি, কি পড়ে তবে রোমাঞ্চ অনুভব করবে ?'

বসন্তবাবু বলেন, 'টাকাপত্তর বুঝি তোমার ওই সীতেশ মামার কাছেই রাখতে দাও ? তা দিও ভাল কথা ! সরল শিশুর মত ছেলে, তবে হিসেবটা একটু রেখো।'

নীলরতনবাবু মাঝে মাঝেই উপদেশ দেন, 'বেশ জবজবে করে তেল মাখবে, বুঝলে ? নিয়মিত তেল মাখলে স্বাস্থ্য কখনো খারাপ হয় না।'

মুখুয্যে মশাই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। তিনি আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেন, 'ওই ঝি মাগী তোমার ঘর মুছতে ওপরে টোপরে যায় নাকি ? যায় না তো ? ভাল। কাপড়চোপড় কেচে দেয় ? দেয় না ? নিজেই কাচো ? ভাল ভাল। ইয়ংম্যান, নিজের কাজ নিজে করে নেবে সেটাই ঠিক। বলছি কেন জানো ? মাগী বড় গায়ে পড়া……তোমার মতন এমন সোনার কান্তি তরুণ যুবা-

পুরুষটি দেখলেই গায়ে পড়তে আসবে। নিজে খুব শক্ত হবে, বুঝলে? খুব শক্ত।'

নিমাই আড়ষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিমাই চোখের সামনে শুধু ছায়া কি যেন দেখতে পায়। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন?

তবু নিমাই কি সেই বৃষ্টির রাতের অভিজ্ঞতার কথা দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল?

বৃষ্টি পড়ছিল সন্ধ্যা থেকে।

আর ছাদ দিয়ে জলও পড়তে শুরু করেছিল আস্তে আস্তে।

সেই জল গড়িয়ে এসে মেজের বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছিল। শুতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিমাই।

কিন্তু মামার স্নেহকণ্ঠ অভয় দিল তাকে।

'ও বিছানাতে শুতে পারবে না নিমাই, এসো আমার চৌকিতেই এসো। এদিকটায় জল পড়ে না।'

নিমাই সঙ্কুচিত গলায় বলে, 'আপনার সরু চৌকি—'

'তা হোক, তা হোক। হয়ে যাবে একরকম করে। নয়তো সারারাত টুলে বসে থাকবে নাকি?'

নিমাই মরিয়া হয়ে বলে, 'আমি বরং নীচে কারো ঘরে—বড় ঘর আছে?'

'নীচে আবার কার ঘর? হুঁ। কেউ শুতে দিতে চাইবে না। সব কটা হচ্ছে একের নম্বর স্বার্থপর। চিনি তো! সাধে আমি কারুর সঙ্গে মিশতে চাই না। না না, তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো।'

নিজেকে আধখানা করে ফেলে জায়গা বার করে দিয়েছিল সীতেশ মামা।

তারপর বৃষ্টি—আরো বৃষ্টি।

তারপর মেঘের ডাক।

তারপর সেই ভয়ংকর বজ্রপাত।

সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

কেমন করে যে দরজার ছিটকিনি খুলে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিল নিমাই জানে না।

কেমন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল তাও জানে না। জানে না কার ঘরের দরজায় সজোরে করাঘাত করেছিল, মেঘবৃষ্টি গর্জন ছাপিয়ে।

তার শুধু মনে হয়েছিল, ওই ভয়ঙ্কর বাজটা একটা বাঘের হাঁ নিয়ে নিমাইয়ের পিছু পিছু তেড়ে আসছে।

কোনো রকমে কারো ঘরে ঢুকে আত্মরক্ষা করতে হবে নিমাইকে।

প্রথমটা নয়নবাবু ভেবেছিলেন বাতাসের শব্দ। কিন্তু মুহুমুহু এই ধাক্কা বাতাসের? চোর-টোর নয় তো?

পার্টনার বিনোদবাবুর ঘুম বেশী গাঢ়, তবু তিনিও জেগে গেলেন।

বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'কে যেন দোর ঠেলছে!'

'কে?'

'তা জানি না।'

'খুলে দেখবেন তো?'

'সাহস পাচ্ছি না!'

সাহস হয়তো বিনোদবাবুও নিজে একা হলে পেতেন না, কিন্তু নয়নবাবুর কর্মের প্রতিবাদকল্পে বিনোদবাবু সাহস পান।

তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, 'ভয়টা কিসের?'

তারপর ছিটকিনিটা খুলে ফেলে, দরজাটা চেপে ধরে আধখানা চোখ বাইরে ফেলে বলেন, 'কে?'

অস্বাভাবিক একটা ভাঙা গলা বলে উঠে—'আমি'।

'আমি'।

'আরে আমাদের সীতেশ মাষ্টারের ভাগ্নে না?'

দরজাটা খুলে ফেলেন বিনোদবাবু।

ভূতাহতের মত আছড়ে এসে ঢুকে পড়ে ছেলেটা।

'নয়নবাবু, আমি এ ঘরে শোবো।

অনেকক্ষণ হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অবশেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো ছেলেটা।

ঘুমিয়ে পড়ার পর এই দুই পরম শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো চোখোচোখি করে বলেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ?'

'হুঁ। পারছি বৈ কি !'

'এই সব লোক শিক্ষকতা করে ! জাতির ভবিষ্যত্যের শিক্ষার ভার এদের হাতে। ছিঃ !'

পটলডাঙ্গার মেস ছাড়লো নিমাই।

ঠিক সেই বৃষ্টির পরদিন না হলেও, ক'দিন পরেই।

সীতেশ মাষ্টার তো পরদিন সকালেই বাড়ী থেকে হঠাৎ শক্ত অসুখের খবর পেয়ে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে চলে গেছে হুড়মুড়িয়ে।

নিমাই দু'দিন মলিন মুখে কলেজ গেল-এলো, এবং বিনোদ বাবুদের ঘরেই বাস করলো।

কুটিল বিনোদবাবুই কথাটা পাড়লেন, 'তোমার টাকা পয়সা-গুলোও কি মেরে নিয়ে গেছে নাকি ?'

মেরে যে অনেকেই নিয়েছে তলে তলে, সে কথা বলতে পারলো না নিমাই। মাথা নীচু করে বললো, 'না পোস্ট অফিসে আছে।'

'তবু রক্ষে ! তা' দেখো বাপু, তোমার মত ছেলের এই পরিবেশে থাকা ঠিক নয়। আর কিছু নয়—সকলেই হচ্ছি বয়স্ক, আর তুমি ছেলে মানুষ। ভাল লাগবে কেন ? তা' আমি বলছিলাম কোনো-খানে গৃহশিক্ষক হিসেবে থেকে লেখাপড়া কর।'

আগের থেকে অবশ্য কিছু কথাবার্তা শিখেছে নিমাই। সে শুধু বলে, আমায় কে মাষ্টারী দেবে?'

'দেবে। দেবে না কেন? বি, এ, ক্লাসের ছেলেকে কি আর পড়াতে যাবে? নীচু ক্লাসের একটা ছেলেকে পড়াবে, বাড়ীর ছেলের মতো থাকবে—'

নিমাই এখন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছে, তাই নিমাই আর আকাশ কুসুম দেখে না।

অতএব নিমাই আবারও হাসে। সবই তো বুঝলাম, কিন্তু সেই বাড়িটা পাচ্ছেন কোথায়?'

'পাচ্ছেন কোথায়' সে কথা বিনোদ বাবু ভাঙেন, তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক খোঁজ করছেন ওই রকম একটি ছেলে।

বি, এ, এম, এ, পাশ করা মাষ্টারদের ডাঁট বেশী, মাইনে বেশী। তাই অল্পবিদ্যে মাষ্টার চাইছেন। যাতে মাইনেও বেশী নেবে না, ডাঁট বেশী করবে না।

'তবে একটা কথা—'নয়নবাবু কথা জুড়েছিলেন, 'তোমার ওই রূপটিই হয়েছে সর্বনাশে।'

নিমাই চমকে তাকায়।

নয়নবাবু বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলেন, 'বাড়িতে আর কোন্ কোন্ মেম্বার আছে জানেন?'

'আরে দূর মশাই, রাতদিন নাটক নভেল পড়ে পড়ে আপনার—'

'নাটক তো দেখলেনও—

'তা' বটে।'

নিমাই এসব কথার কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না।

কিন্তু নিমাই এই গলির বন্ধন থেকে মুক্তির আশায় উৎসুক হয়।

কলেজে একটি মাত্র ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে। আর সকলেই যেন কেমন ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকায়।

নিমাই যে ধুতি আর ছিটের শার্ট পরে কলেজে আসে এটা হাসির, নিমাই যে কোন একটা গন্দগ্রাম থেকে এসেছে এবং তার গায়ে যে গ্রামের সোঁদা মাটির গন্ধ এখনো লেগে আছে, এটা হাসির।...এই কলকাতার যে কিছুই জানে না ছেলেটা এটা হাসির, পলিটিক্সের 'প' বোঝে না, এটা হাসির, এবং বেটাছেলে হয়েও যে ওর তরুণী মেয়ের মতো রুপলাবণ্য—এটাও হাসির।

এতগুলো হাসির খোরাক যে যোগায়, তাঁকে দেখে ব্যঙ্গের চোখে তাকাবে না ওরা ? শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে না, 'গোলাপ গুচ্ছ', 'ডালিম ফুল', 'পাকা টমেটো', 'খুকুমণি' !

নিমাই শুনতে পেয়েও শুনতে না পাওয়ার ভান করে, বইয়ের পাতায় চোখ রাখে, আর ওর সেই ফেলে আসা গ্রামের নদীর ধারটার জন্যে হাহাকার করে ওঠে মনের মধ্যে।

পিসি বলেছিল, 'কী দরকার বেশী লেখাপড়ায় ? ঘরের ছেলে ঘরে থাক !

পিসির কথাটা হাস্যকর ঠেকেছিল, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যি—কী দরকার ? বেশী লেখাপড়া শিখে কি সত্যিই খুব উঁচুদরের মানুষ হওয়া যায় ?

সীতেশ মাষ্টার তো এম, এ, পাশ !

এই কলেজের অধ্যাপকরাও তো মস্ত মস্ত বিদ্বান। কই, কাউকে দেখেই তো শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠে না !

আর এই সব স্টুডেন্ট্রা ?

থার্ডইয়ারের-ফোর্থ ইয়ারের ?

এদের মধ্যেই বা কোথায় সে নম্রতা, ভব্যতা, সভ্যতা—যা দেখলে মনে হতে পারে, এই—এই হচ্ছে বিদ্যের মূর্তি।

এক কথায় অধ্যাপকদের মুখের উপর চোটপাট, বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে হাতাহাতি, পলিটিক্স্ নিয়ে মাথা ভাঙাভাঙি—এসব দেখে, আর হতাশ হয় নিমাই।

নিমাইর যেন প্রতিমুহূর্তে স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে।

কলেজে যার সঙ্গে ভাব হয়েছে নিমাইয়ের, তার নাম মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক খাস কলকাতারই ছেলে; 'দেশের বাড়ি' বলে কোন শব্দ ওদের পরিবারের অভিধানে নেই। কলকাতাই দেশ।।

কলকাতা যখন হিজলগাছের ছায়ায় ঘুমোতো, আর তার বাদাবনে সাপেরা সুখে সংসার করতো, তখন মৃগাঙ্কের কোন উর্দ্ধতন পুরুষ কোথা থেকে যেন এসে সেই কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর ভগবান জানেন কেমন করে যেন দাঁড়িয়েও পড়েছিলেন।

কালক্রমে কলকাতার অতি গভীরে শিকড় চালিয়ে তিনি নাকি একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছিলেন, এবং অনেকের আশ্রয়দাতা ও অনেকের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিলেন। 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'-র লালমুখো সাহেবরা নাকি তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল। সে যাই হোক—মোট কথা যা তিনি সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছিলেন তার তলানি ভাঙিয়েই এখনো চলছে মৃগাঙ্ক মল্লিকদের। বড়বাজারের বানিয়া মহল এখনো ওদের নামে হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। কারণ এখনো পর্যন্ত ওদের জীবিকার ধারা ওই বড়বাজারের গোলক ধাঁধাঁর মধ্যেই আবর্তিত। বংশের মধ্যে কেউ কেউ কখনো জাঁকিয়ে উঠে পুরনো নামকে উজ্জ্বল করেছে। কেউ কেউ সে ঔজ্জ্বল্যে কালি লেপেছে, এখন প্রায় মুমূর্ষু দশা।

তবু এখনো মৃগাঙ্কদের সেই দেড়হাত চওড়া কার্নিশ আর দশহাত উঁচু দরজা সম্বলিত বাড়িটা উত্তরকলকাতার একটা সঙ্কীর্ণ গলির সব আলো আড়াল করে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। এমনই পাকা মাল-মশলা দিয়ে গড়া হয়েছিল যে, জরা তাকে জীর্ণ করে ফেললেও ফেলে দিতে পারেনি।

মৃগাঙ্কদের সেই বাড়ির মেজে আগাগোড়া মার্বেল মোড়া, দালান থেকে দু'বাহু প্রসারিত করে উঠে যাওয়া চওড়া কাঠের সিঁড়িতে এখনো কার্পেট পাতা, ঘরে ঘরে উঁচু উঁচু মেহগিনির পালঙ্ক, বিশাল

বিশাল ড্রেসিং আয়না, বড় বড় গোল টেবিল, আর হলঘরের সিলিং থেকে দু'দুটো ঝাড়লণ্ঠন দোদুল্যমান।

নিমাই প্রথম দিন বেড়াতে এসে হাঁ হয়ে গিয়ে বলেছিল, 'তোমরা তাহলে রাজা ছিলে?'

হতভম্ব হয়েই বলেছিল।

নিমাইয়ের অনভিজ্ঞ গ্রাম্য চোখে ধরা পড়েনি, ওই মার্বেলগুলো পালিশ হারানো হলদেটে, কার্পেটগুলো জীর্ণ বিবর্ণ শতছিদ্র। আসবাব-গুলো হাস্যকর রকমের সেকেলে, আয়নার কাঁচ বয়সের দাগে কলঙ্কিত, আর ঝাড় লণ্ঠনের কংকালটাই শুধু অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতে ঝুলে মরছে।

নিমাই তাই বলেছিল, 'তোমার বাড়ি দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে ভয় করছে।

মৃগাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, আরে দূর দূর! রাজা না হাতী! স্রেফ্ বেনে। একেবারে বেনের বংশ। শুধু লোক ঠকিয়ে কিছু পয়সা করে ফেলে কর্তারা খুব লপচপানি দেখিয়েছিল। এখন তো ভাঁড়ে মা ভবানী। তাল পুকুরে ঘটি ডোবে না।'

নিমাই কোনদিন ওই প্রবাদবচনটা শোনেনি, তাই অবাক হয়ে বলেছিল, 'পুকুরও আছে তোমাদের?'

মৃগাঙ্ক প্রথমটা বুঝতে পারে নি প্রশ্নটা, তারপর প্রবল ভাবে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'নাঃ! তুই একেবারে দুগ্ধপোষ্য! তোকে মানুষ করতে সময় লাগবে। হবি কিনা তাই বা কে জানে। তালপুকুরে ঘটি ডোবেনা মানে কি তাও জানিস না?

অতঃপর মানেটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'এই বাড়ি তিন দফা মর্টগেজ করা আছে বুঝলি? আর সোনা বলতে বাড়িতে কিছু নেই। নেমন্তন্ন যেতে হলে মা কাকিমাদের সেই আদ্যিকালের জড়োয়া গহনা গুলো ছাড়া গতি নেই। ওগুলো তো বিক্রী করলে দাম ওঠে না।.........বাড়ির পিছন দিকে একটা মন্দির আছে দেখেছিস?

দেখিসনি? আছে, ঠাকুরদার বাবার প্রতিষ্ঠিত শিব আছে সেখানে। ......দুবেলা পুরুত এসে ঘণ্টা আর টিকি নেড়েও যায় বাধা নিয়মে। কিন্তু কি ভোগ হয় জানিস বিগ্রহের? পোকা ধরা ছোলা ভিজে। কড়ে আঙ্‌লা কলা আর গুণে গুণে পাঁচখানা বাতাসা। ঘেন্না ধরে গেছে বুঝলি? এই রাজগিরির মড়া আগলে পড়ে থাকায় ঘেন্না ধরে গেছে।'

নিমাই নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কি জানি ভাই, আমি তো এসবের একটা কণাও কখনো চোক্ষে দেখিনি। আমার দেখে শুনে রাজাই মনে হচ্ছে তোমাদের।'

মৃগাঙ্ক নিমাইকে 'তুই' করে কথা বলে, কিন্তু নিমাই কিছুতেই পারে না। নিমাইয়ের জিভে বাঁধে।

নিমাই এমনিতেই ভীরু, কুণ্ঠিত। তার উপর আবার এই ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি দেখে মাথা টাতা ঘুরেই গিয়েছিল তার। ওর ঝাড় লণ্ঠনের একটা নোলকও যদি নিমাই ছেলেবেলায় খেলতে পেতো, তাহলে বোধহয় পরীরাজের স্বপ্ন দেখতো।

এদের বাড়ির রাস্তাটা প্রায় পটলডাঙ্গার মেসের মতই সর্পিল গলি। কিন্তু গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লে অগাধ জায়গা। অনেক শরীকের জিনিস বলেই বোধকরি অতোখানি জমি হেলায় ফেলায় পড়ে আছে কলকাতার মতো জায়গায়। টুকরো করে বেচে বেচে টাকা ঘরে তোলবার অধিকার কারো নেই। তাই 'বাগান' নামধারী বিরাট অংশটায় শুধু কিছু বড় বড় বিলেতী পান গাছ আর কয়েকটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফুলগাছ ছাড়া আর কিছুই প্রায় নেই। শুকনো ঘাসের বনের মধ্যে একটি জলশূন্য ফোয়ারার যে লাস্যময়ী একটি প্রস্তর প্রতিমা শিথিল ভঙ্গীতে বিরাজিত, তাকে দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

'ফোয়ারাটায় জল উঠছে না?'

ছেলেমানুষের বেহদ্দ এই প্রশ্নটি করে বসেছিল নিমাই,

ফোয়ারার জলের উৎস মুখটাই যে ভাঙা মরচে গড়া, তা বুঝতে পারেনি।

মৃগাঙ্ক দার্শনিকের হাসি হেসে বলেছিল, নাঃ, জল আর ওতে উঠবে না কোনদিন ; সব জল জমে পাথর হয়ে গিয়েছে।

নিমাই আর কোন প্রশ্ন করেনি।

নিমাই বুঝেছিল এখানে যা কিছু দেখেই প্রশ্ন করবে সে, সেটা বোকার মতই হবে। ও শুধু মুগ্ধ কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে দেখে বেড়িয়েছিল বাগানটা। বাগানে জল দেবার জন্যে মাঝে মাঝেই জলের কল আছে। সেই কলগুলোর মুখ কি অদ্ভুত বিচিত্র। কোনটায় বাঘের মুখ, কোনটায় মাছের মুখ। আশ্চর্য, ফোয়ারার মত সেগুলোও সব জল হারিয়ে শুকনো হয়ে পড়ে আছে।

হয়তো ভিতরের নল ক্ষয়ে ক্ষয়ে পঞ্চত্ব পেয়েছে, হয়তো বা নলের মধ্যে মরচেয় মরচেয় জং ধরে গেছে ?

নিমাইয়ের মনটা হায় হায় করে উঠেছিল। নিমাইয়ের মুখের আগায় আসছিল, এমন সুন্দর জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে ? সারিয়ে নেওয়া হয় না কেন।

কিন্তু নিমাই ওইটুকুর মধ্যেই একটু চালাক হয়ে গিয়েছিল, তাই মুখের কথা মুখের মধ্যেই বন্দী করে রেখেছিল।

শূন্য গোলা, তবু বড় গোলা।

মরা হাতি, তবু লাখ টাকা !

কলেজ ফেরৎ ছেলের বৈকালিক জলখাবারের সময় ছেলের বন্ধুরও খাবার এসে হাজির হয়েছিল প্লেটে করে। ধবধবে ময়দার ফুলকো লুচি, আলুর দম, বেগুনভাজা রসগোল্লা।

কুণ্ঠিত নিমাই আরো কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল দু'প্রস্থের আবির্ভাবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো, মৃগাঙ্ক রেকাবী-বাহী চাকরটিকে নিচু গলায় তীক্ষ্ণ ভৎর্সনা করলো, সেই পচা মার্কা এক ঘেয়ে মাল ? নতুন

কিছু জোটেনা একদিন ? যা, বাড়ির মধ্যে বলগে যা, মিষ্টি-ফিষ্টি যদি থাকে আরো দিতে।

মৃগাঙ্ক ছেলেমানুষ। তবু মাকে বলগে', কি 'ঠাকুরমাকে বলগে', বলেনি, বলেছিল 'বাড়িতে বলগে'। কিন্তু মৃগাঙ্কর অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন নিমাই। এই যদি পচামার্কা হয় তবে ভাল খাবার কাকে বলে ?

চাকরটা বাড়ির মধ্যে গিয়ে আবার একটা রেকাবীতে দুটো বড় সন্দেশ আর দুটো মর্তমান কলা নিয়ে এসে ধরে দিয়েছিল। পাশে দুফালি আমের মোরব্বা।'

'এই তো ছিল তো আরো কিছু—'মৃগাঙ্ক একটা রেকাবী টেনে নিয়ে অপরটা নিমাইয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'এই নে খা। আমার ঠাকুমাটি বুঝলি 'কেপ্পন নম্বর ওয়ান'।

নিমাইয়ের বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। নিমাই অবাক হয়ে গিয়েছিল—'ঠাকুমাকে' এভাবে বলা যায়।

নিমাই এ সময় কথা না বলে পারেনি। বলেছিল, 'ঠাকুমাকে তুমি এরকম বলছো ? ছি।

মৃগাঙ্ক অপ্রতিভ হয়নি, শুধু একটু হেসে বলেছিল, 'তোর সামনে বলাটা উচিত হয়নি বটে। তুই যে একেবারে সোঁদা'।

নিমাই জানতো—মাটি সোঁদা হয়; মানুষ কোন অর্থে সোঁদা হয় তা জানা ছিল না নিমাইয়ের।

নিমাই তখন বলেছিল, এতো খেতে পারবো না।'

মৃগাঙ্ক বলেছিল, 'অতো অতো বলে লজ্জা দিসনা বাবা, এমনিতেই দেখে রাগ ধরে গেছে আমার। আগে বাইরে কেউ এলে কখনো চপ কাটলেট ছাড়া আপ্যায়ণ করা হতো না। আমার ছেলে-বেলাতেই দেখেছি, লুচি দিলো তো তার সঙ্গে অন্ততঃ কষা মাংস।'

নিমাই হেসে ফেলে বলেছিল, 'বাঃ, ও সব জিনিস তক্ষুণি তক্ষুণি হয় না কি ?'

'তক্ষুণি তক্ষুণি হবে কেন? মজুতই থাকতো। নিজেদের যে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সবই অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল। তা ওই খেয়ে খেয়েই ফাঁক করলো সব। এখন কর্তাদের আর খাবারও হিম্মত নেই, কারো ডায়বিটিস্, কারো ডিস্পেপসিয়া, কারো হাইপ্রেসার। ইতিহাসের লেখা। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই ধরণেরই কথা মৃগাঙ্কর। কখনো ছ্যাবলা গলায়, কখনো দার্শনিকের গলায়। নিমাইয়ে একটা তীব্র আকর্ষণ জন্মে গিয়েছে। নিমাই-এর আগে এরকম কথাই কখনো শোনে নি।

তা নিমাইয়ে কথা যেন বোঝা গেল। মৃগাঙ্ককে দেখে ওর অপরিণত অজ্ঞ চোখে মায়ার ঘোর লেগেছে। কিন্তু মৃগাঙ্ক? মৃগাঙ্ক কেন ওই নিরীহ আর শিশুর মতো সরল ছেলেটার সঙ্গে ভাব করতে এলো?

হ্যাঁ, ভাব করতে মৃগাঙ্কই এসেছিল।

কেন এসেছিল তা সে নিজেও জানে না। নিমাইয়ের রূপে আকৃষ্ট হয়ে? নাকি ওর ওই নিরীহ ভঙ্গী দেখে ক্ষ্যাপাবার ইচ্ছেয়?

হয়তো তা নয়।

হয়তো মমতাতেই।

তবে অন্য ছেলেরা বলে 'ধূতিতে ধূতিতে গাঁটছড়া'।

ক্লাশে একমাত্র মৃগাঙ্কই ধুতি পরে আসতো।

লম্বা কোঁচা, শান্তিপুরে ধুতি, চিকনের কাজ করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী, সেন্টের গন্ধে অমোদিত রুমাল—এই সব হচ্ছে মৃগাঙ্কর সাজ। ছেলেরা ওর সম্পর্কে বলতো, 'জামাইবাবু', 'পুষ্যি পুত্তুর' ইত্যাদি।

আর সকলেই হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার, নচেৎ শার্ট-পায়জামা পরে আসে।

নিমাইও এলো ধুতি পরে।

যদিও সে ধুতি মৃগাঙ্কর ধুতির সমগোত্র নয়, তবু নামটা তো

এক। অতএব খাটো বহরের মিলের ধূতির সঙ্গে ছিটের শার্ট পরে এসে অন্য সবাইয়ের কাছে হাস্যকর হলেও, হয়তো সত্যিই মৃগাঙ্ক ওই জন্যেই তাকে ডেকে কথা কয়েছিল। অথবা হয়তো সেসব কিছুই নয়, এমনিই!

মোট কথা, প্রথমেই মৃগাঙ্কই বলেছিল, 'তুমি এতোদিন পরে এলে? ক্লাশ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

'আপনি' বলেনি, 'তুমি' বলেছিল।

নিমাই আস্তে বলেছিল, 'আমি গ্রামে ছিলাম।'

উত্তরটা অবশ্য প্রাঞ্জল নয়। গ্রামে থাকলে যে যথাসময়ে আসা যায় না, এর কোনো যুক্তি নেই। তবে সে প্রশ্ন করেনি। মৃগাঙ্ক মুচকি হেসে বলেছিল, 'গ্রাম থেকে এসেছো' সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তা' কোন জেলা? আর উত্তর শুনে বলেছিল, 'শান্তিনিকেতনে পড়লে না কেন?'

নিমাই মাথা হেঁট করে বলেছিল, 'কলকাতায় আসবার ইচ্ছে হলো।'

'হুঁ। সেটা আগেই বুঝেছি—'মৃগাঙ্ক আবার হেসে বলেছিল, কলকাতাই হতভাগা গ্রাম গুলোর মাথা খেয়েছে। তা অমন ক'নে বৌয়ের মতো লজ্জা কেন? কলেজে পড়তে এসেছো, লজ্জা করলে লোকে হাসবে না?'

ব্যঙ্গ, তবু তার মধ্যে যেন কোথায় একটু সহৃদয়তার স্বাদ জড়িত ছিল, নিমাই কৃতার্থমন্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হেসেছিল।

মৃগাঙ্ক বলেছিল, 'ও বাবা' এ যে আরো বেশী হলো! একেবারে শুভদৃষ্টির চাউনি! ছেলেগুলো তোমায় খেয়ে ফেলবে। বেটাছেলের এতো লজ্জা কিসের? নাঃ, তোমায় মানুষ করতে হবে।

সেই হয়ে গেল বন্ধুত্ব।

নিমাইয়ের মনে হলো, একটা, অভিজ্ঞ মানুষ, একটা সবল হাত, তার দায়িত্ব নিলো।

নিমাই মৃগাঙ্কর বশীভূত হ'য়ে গেল।

মৃগাঙ্কও কেন কে জানে, ওই বোকা লাজুক ছেলেটাকে একটু নেকনজরে দেখতে শুরু করলো। ক'দিনের আলাপেই ওকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল।

নিমাই তো বশীভূত হয়েই গিয়েছিল, আরো মোহিত হলো মৃগাঙ্কর বাড়ি দেখে। এটা তার কল্পনার বাইরে ছিল।

শুধু যে বৃহতের মহিমায় মোহিত হয়েছিল নিমাই, তা নয়। ওই জরাগ্রস্ত বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে থেকে কোথায় যেন নিমাই তার সেই ফেলে আসা গ্রামের আত্মার হাহাকার শুনতে পেয়েছিল।

কথাটা বলতে গেলে হয়তো হাস্যকর রকমের অদ্ভুত লাগতে পারে, তবু ওটা মনে হতো নিমায়ের।

নিমাই মাঝে মাঝেই যেতে থাকলো মৃগাঙ্কর বাড়ি। কিন্তু মৃগাঙ্কর কথাবার্তা কি সর্বদাই খুব ভালো লাগতো নিমাইয়ের? মৃগাঙ্কর ওই গুরুজন সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব, জগতের সব কিছুতেই অশ্রদ্ধেয় উক্তি, ভগবানকে নস্যাৎ করা, ইত্যাদি নিমাইকে পীড়িত করতো, উত্তেজিত করতো, তর্ক করতো, তবু মৃগাঙ্ককে ভালো না বেসেও যেন পারতো না নিমাই। হয়তো নিজে মৃদু বলেই ওই প্রাবল্যের প্রতি আকর্ষণ ওর।

কিন্তু খুব বেশীদিন মৃগাঙ্কর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রইল না। প্রথমে তার বাড়ি যাওয়াটা বন্ধ করতে হলো, তারপর তার সঙ্গে মেশাটা।

কারণ অবশ্যই ছিল একটা, কিন্তু সেটা নিমাইয়ের কাছে যতটা 'ভয়ঙ্করী মূর্তিতে' দেখা দিয়েছিল, আর পাঁচটা সাধারণ-বুদ্ধি ছেলের কাছে হয়তো ততোটা হতো না।

প্রথমটা হচ্ছে মান অপমানের প্রশ্ন।

মৃগাঙ্কর বাড়িটা যেন নিমাইকে অনবরত অদৃশ্য আকর্ষণে টানতো, তাই প্রাই প্রায়ই ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো নিমাই কলেজের শেষে। মৃগাঙ্কও পরম আগ্রহে ডেকে নিয়ে যেতো। কথাও বলতো

খুব। মৃগাঙ্কের সে সব কথার মধ্যে রাজনীতি টিতি ছিল না, ছিল শুধু ওর নিজের বাড়ী সম্পর্কে অপরিসীম একটা ঘৃণা আর পৃথিবীর অন্য সব দেশের সমাজের কথা। যখন তখনই তাই বলতো ও, 'দূর' সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবো একদিন।

এই বাড়িটা ছেড়ে যে কেউ চলে যেতে চাইতে পারে এটা নিমাই ভাবতেই পারতো না, তাই বলতো, 'ধেৎ!'

মৃগাঙ্ক বলতো, দেখিস। জন্মাবধি শুধু নোংরামী নীচতা আর ক্ষুদ্রতা দেখে দেখে হাড় জ্বলে গেল। অথচ আবার কি জানিস, রক্তের ঋণ দাবী জানায়, মনে হয় এক এক সময় তার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করে বসতে হবে বুঝি। হাঁ করে চেয়ে রইলি যে? মানে বুঝতে পারলি না বুঝি ? শোন তবে,এই আমাদের বংশে সাত পুরুষ ধরে একটি ট্রাডিশান চলে আসছে বুঝলি ? সেটি হচ্ছে মদ খাওয়ার ট্রাডিশান। তাছাড়া আরো আছে। টাকা থাকার অভিশাপ আর কি।……দেখে দেখে ঘৃণা আসে, কিন্তু গায়ের মধ্যে তো সেই বংশের রক্ত ? তা'কে আমি দাবাবো, না সে আমায় দাবাবে, এখন বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝেই ভয় হয় এই পরিবেশটা থেকে চলে যেতে পারলে—'

'তা' রক্তটা তো ফেলে যেতে পারবে না ?' বলে হাসতো নিমাই।

মৃগাঙ্ক বলতো, সেই তো নিরুপায়তা। এক এক সময় মনে হয় ডাক্তারী প্রক্রিয়ায় যদি সব রক্ত পাম্প করে বাদ দিয়ে ফেলে নতুন কোন রক্ত, কেনা রক্ত দেহে ভরতে পারতাম, হয়তো বেঁচে যেতাম।'

'তোমার যত উদ্ভট কল্পনা!'

হাসতো নিমাই।

মৃগাঙ্ক বলতো, 'মরে পড়ে আছি রে, তাই বাঁচার কল্পনা।'

তা নিমাইও একদিন ওই বাড়ির ক্ষুদ্রতার পরিচয় পেয়ে মরমে মরলো।

কলেজ ফেরৎ আসতো নিমাই,এবং যথারীতি দু'জনেরই জল খাবার আসতো বাইরের ঘরে, এবং নিমাই যতোই 'না না, করুক খেতেই হতো মৃগাঙ্কর অনুরোধে।

সহসা একদিন ঘটলো বিপর্যয়।

মৃগাঙ্ক বললো, 'তুই বোস আমি একটু চান করে আসি, বড় গরম লাগছে।

চলে গেল মৃগাঙ্ক, নিমাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরের সীলিংটা কী উঁচু, আর সেই উঁচুতে রঙিন বর্ডারে কতো কারুকার্য।

এই সময় কানের পাশে বাজ পড়লো।

কর্কশ একটা কণ্ঠ দরজার ওপাশে কোথায় যেন বেজে উঠলো 'ছোড়াটা কে রে গোকুল! নিত্য নিত্য আসে ঠিক খাবার সময়টিতে। খাওয়া দেখে তো মনে হয় সাতজন্মে এসব চোখেও দেখেনি। মৃগঙ্কটাও যেমন, যতো রাজ্যের হা-ঘরের ছেলের সঙ্গে ভাব।......... থাক্ থাক্, ওকে আর দুটো রাজভোগ দিতে হবে না, তুলে নে একটা।

বাজ থেমে গেল।

কিন্তু নিমাইয়ের মনে হলো, সেটা যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে বেজেই চলেছে তার কানের পর্দা দুটো ফুটো করে ফেলার উদ্দেশ্যে।

নিমাই কি ছুটে পালিয়ে যাবে?

মৃগাঙ্ক এসে পড়বার আগেই?

কিন্তু কি করে যাবে?

নিমাইয়ের কী নড়বার ক্ষমতা আছে? নিমাইয়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত রোমকূপ দিয়ে যেন একটা দাহ বেরোতে থাকে। চোখের সামনের দৃশ্যগুলো সব একাকার হয়ে ঝাপসা হয়ে যায়। নিমাই সেই অবস্থায় বসে থাকে।

একটু পরে মৃগাঙ্ক ফেরে, হেসে হেসে বলে, 'খুব দেরি করে

ফেললাম না? যা গরম, জল ঢালছি তো ঢালছিই।......কী রাগ হয়ে গেছে না কি?

নিমাই যেন মানুষের গলার সাড়া পেয়ে তবে দাঁড়াবার শক্তি খুঁজে পায়। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি যাই।'

'ওকী! যাবি মানে?' মৃগাঙ্ক অবাক হয়। সত্যি রাগ না কি?

'রাগ কিসের?' বলে নিমাই চলে যেতে উদ্যত হয়।

মৃগাঙ্ক বলে ওঠে; 'কিসের তা জানিনা, তবু হয়েছে তাতে সন্দেহ নাস্তি। বল বাবা কী করেছি, প্রায়শ্চিত্ত করি। শুধু ওইটুকু দেরীর জন্যে!—

'আমার শরীর খারাপ লাগছে।'

'শরীর খারাপ লাগছে?' তাই বল। তা লাগতেই পারে। আমার তো মনে হচ্ছিল চান না করে মারা যাবো। এক কাজ কর, তুই ও একটু চান করে নে। এই পাশেই আমাদের একটা গেস্টরুম আছে, এ্যাটাচ্‌ড বাথ আছে—

'না আমি যাবো—'

'সেরেছে! হলো কি তোর? তা অন্ততঃ একটু কিছু খাবি তো? কলেজ থেকে এলি?

নিমাইয়ের গলা বুজে আসছিল, আর চোখে জল আসছিল, তবু নিমাই মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের বাড়ি খেতে আসি না মৃগাঙ্ক! আমি গরীব বটে; তবে—।

আর কিছু বলতে পারেনি।

চলে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি।

মৃগাঙ্ক কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল। আর যখন গোকুল খাবারের রেকাবী দুটো নিয়ে ঘরে ঢুকছিল, তখন ছিটকে উঠে বলেছিল, 'খাবো না! নিয়ে যা, যা বলছি।'

বলা বাহুল্য গোকুল আজ্ঞাপালন করেনি, দাঁড়িয়েই থেকেছে

এবং মৃগাঙ্ক যখন তেড়ে উঠে বলেছে, 'তবু দাঁড়িয়ে রইল ? যা বলছি —'তখন বিনীত নিবেদনে জানিয়েছে দাদাবাবু অনর্থক তার ওপর রাগ করে কি করবে, স্বয়ং ঠাকুমা নিজে দুটো রাজভোগ থেকে একটা তুলিয়ে দিয়েছেন।

গোকুল হয়তো ভেবেছিল মিষ্টান্নের ঘাটতিই মৃগাঙ্কর ক্রোধের হেতু।

মৃগাঙ্ক কিন্তু এ কথায় চমকে ওঠে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'কি করেছে ঠাকুমা।'

গোকুল বড়লোকের বাড়ীর চাকর, এর কথা ওর কাছে লাগিয়ে দেওয়াই তার পেশা। আর এর থেকেই সে সংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত, এর থেকেই তার উপরি আয়। তাই সে গলা নামিয়ে বলে, 'ওই তো যা বললাম। যা প্রকৃতি তাই করেছে। থালা থেকে রাজভোগ তুলিয়ে রাখার হুকুম দিয়ে বললো, 'কোথা থেকে একটা হা-ঘরের ছেলে এসে জুটেছে, রোজ এসে খাচ্ছে। খোকার যতো ভিখিরির সঙ্গে ভাব, এই সব আর কি।'

'বলেছে এই সব ?'

'না-তো কি বলছি দাদাবাবু ?'

মৃগাঙ্ক আর একবার ছিটকে উঠে বলে, 'কখন বললো ? কোথায় বললো ?'

'এই তো এখন। ওই দরজার আড়ালে। আপনি তখন চানের ঘরে।'

'চেঁচিয়ে বলেছিল ?'

'তা আর বলতে! আপনার বন্ধুর কান ফুটো হতে বাকি শুধু।'

একরঙা ছবিতে বহুবর্ণ লেপন করতে পারে গোকুল, এক টাকাকে আঠারো আনা করতে পারে।

মৃগাঙ্ক বললো, বুঝেছি।'

তারপর মৃগাঙ্ক ওর হাত থেকে খাবারের রেকাবী দুটো এক

এক করে নিয়ে সবসুদ্ধ ছুঁড়ে বারান্দা পার ক'রে বাগানে ফেলে দিল।

হ্যাঁ, এ সাহস তার আছে।

কারণ সে পুরুষ।

এই মানী বাড়ির বংশধর।

এদের এসব দেখার অহরহ অভ্যাস আছে। এদের বাড়ীতে ছেলে যেই ষোল পার হয়, সেই তাকে কর্তারা পর্যন্ত সমীহ করে চলেন। অতএব গিন্নীরা এবং চাকর বাকররা। বেটাছেলে মেজাজ দেখাবে এ তো স্বাভাবিক।

দু'একদিন নিমাই পাশ কাটালো। মৃগাঙ্কও উদাসীন থাকলো। কিন্তু মৃগাঙ্কর মুখ বিষন্ন। নিমাইয়ের দুঃখ হয়, অথচ নিমাই এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারে না। অবশেষে একদিন মৃগাঙ্কই এগিয়ে এলো। বললো, 'আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করবি ঠিক করেছিস্ ?'

'বাঃ তা কেন ? সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল তাই—'

'বাজে কথা থামা'—? মৃগাঙ্ক ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তুই ছেলেটা খাঁটি বলেই তোকে ভালবাসি, মিথ্যেকথা বলিসনি। মোটেই সেদিন তোর শরীর খারাপ হয়নি, হয়েছিল মন খারাপ। আমি সব শুনেছি। যাক দেখলি তো, কেন আমার গুরুজনে শ্রদ্ধা নেই, বাড়ির প্রতি ভালবাসা নেই! ওই ওরাই হচ্ছেন আমার গুরুজন।'

নিমাই মাথা হেঁট করে।

মৃগাঙ্ক বলে, 'আমার নিজের প্রতি ঘৃণায় কারো সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না, শুধু তুই গ্রামের ছেলে, সরল ছেলে বলেই···নাঃ গ্রাম থেকে চলে এসে তুই ভালো করিসনি।'

নিমাই এবার মুখ তুলে একটু হেসে বলে, 'তোমার বুঝি ধারণা গ্রামের লোক সবাই দেবতা ?'

'কি জানি! হয়তো নয়—' মৃগাঙ্ক অন্যমনস্কের মতো বলে, পল্লীসমাজও তো পড়েছি। তবু মনে হয় মাঠে ঘাটে খোলা হাওয়ায় পাপের কাদা কিছুটা ধুয়ে যায়, ঝরে যায়।'

আবার চললো মেশামেশি। কিন্তু মৃগাঙ্কর বাড়িতে নয়। মৃগাঙ্ক নিজেই বললো, 'নাঃ বাড়িতে আর যেতে বলবো না তোকে।'

যেতো এখানে সেখানে, হয়তো রেস্টুরেন্টে।

কিন্তু একদিন আবার ঘটলো আর এক দুঃখবহ ঘটনা।

মৃগাঙ্ক একদিন ওকে টেনে নিয়ে গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। আর মুগ্ধ বিমোহিত নিমাই যখন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বলে ফেলেছে, একটু বসলে হয় না।'

তখন মৃগাঙ্ক হেসে বলেছে, 'কি, টায়ার্ড লাগছে? আয় তার ওষুধ দিই।'

ব্যাগ থেকে বার করেছিল ফ্লাস্ক।

'কী এ?'

'বুঝতে পারছিস না?' মৃগাঙ্ক হেসে উঠেছিল, 'সোমরস।'

'তার মানে?'

'তার মানেও জানিস না? উঃ!. এখনো কাঁথায় শুয়ে চুষি খেলেই ভালো হতো তোর। বিশুদ্ধ বাংলায় বলা যায় সুরা।'

ওঃ!' তার মানে মদ? মদ খাবে তুমি?'

'আমি একা কেন, আমরা। একে মদ বলে না বাবা, স্রেফ এনার্জির ওষুধ।'

বলে ফ্লাস্কের মুখ খুলতে থাকে মৃগাঙ্ক।

নিমাই একটু সরে বসে আগ্নিদৃষ্টিতে বলে, 'তুমি না মদকে খুব ঘৃণা করতে?'

'করতাম! এখনো করি। তবু রক্তের ঋণ শোধ না দিয়ে উপায় নেই রে! ঘৃণা করি তবু প্রতি নিয়ত মনে হয় একটু খেয়ে

দেখি। তা মা আমার সহায় হয়েছে, বাবার আলমারি থেকে একটু একটু করে—'

'তোমার মা ? নিজের মা ?'

'তাই তো জানি।' মৃগাঙ্ক মৃদু হাসে, 'ছেলেটাকে হাতের মুঠোয় ধরবার জন্য এই শোচনীয় চেষ্টা। বোধহয় ভাবে এত করে আমি অদ্ভুত মার অনুগত থাকবো। আমাদের বাড়িতে ছেলেরা বড় হলে তো আর মাকে পোঁছে না।'

নিমাই দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'তুমি খাও, আমি চলে যাবো'।

'আহা সে তো যাবিই। একদিন মজা করে একটু খাবি বৈতো নয় ? এতে কিছু আর তুই মাতাল হয়ে যাবি না। তোর তিনকুলে কেউ নেই যে দুঃখ পাবে। আর তোর রক্তেও বিষ নেই যে সেই বিষ তোকে রোজ ঠেলা মারবে। স্রেফ মজা!'

'আমার এসব মজা ভালো লাগে না।'

'খেয়েই দেখ। দেখবি খুব স্ফূর্তি লাগবে।'

'তুমি আমায় খারাপ করবার চেষ্টাতেই মিশেছো ?'

ক্রুদ্ধ গলায় বলে বসেছিল নিমাই।

মৃগাঙ্কও হঠাৎ চড়ে উঠেছিল।

কড়া গলায় বলেছিল, 'ওঃ তাই নাকি ? তাই ভেবে বসে আছিস ? তোর মত একটা মশা মাছিকে খারাপ করেই বা আমার কী গৌরব বাড়বে রে ? জন্মে একবার একটু খাঁটি বিলিতি চোখে দেখতিস, তা কপালে নেই। যা চলে যা, নিজে নিজেই চলে যা। খোকা তো নয় ? আমি এখানে থাকবো, মদ খাবো, বাগানের মধ্যে মাতলামী করবো, দেখবো মজাটা কি। ব্যাস যা চলে যা।'

নিমাই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

এখান থেকে বেরিয়ে নিজে চেষ্টা করে ফেরার কথা অসম্ভব মনে হয়েছিল, তবু চলে এসেছিল।

পরদিন দেখলো মৃগাঙ্ক কলেজে এলো না। পরদিনও না। দুদিন

ছুটি গেল মাঝে, তারপর যখন কলেজে এলো, ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো জীবনেও চেনে না নিমাইকে।

নিমাইয়ের এমন সাহস হল না যে এগিয়ে যায়।

তা ছাড়া গিয়ে করবেই বা কী?

ক্ষমা চাইবে?

সদুপদেশ দিতে যাবে?

না কি তার দলে ভিড়তে বসবে?

নাঃ কিছুই করা যায় না।

কলেজের মধ্যে একেবারে একা হয়ে গেল নিমাই।

কতকগুলো দিনের জন্যে যে স্বর্গলাভ হয়েছিল তার, তার আস্বাদ থেকে আবার ভ্রষ্ট হল সে।

আবার সেই বিছানা, আবার সেই ট্রাঙ্ক, আবার সেই গলির মোড়ে রিকশা।

এবার মেসের ঠাকুর বয়ে দিয়ে গেল।

সঙ্গে চললেন বিনোদবাবু।

মেসের সকলেই একবার ক'রে বিনোদবাবুকে দোষারোপ করতে লাগলেন সীতেশবাবুর অনুপস্থিতে তাঁর ভাগ্নেকে মেস থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়, বাদে নয়নবাবু, আর ম্যানেজার।

কার কাছে বিনোদবাবু কী কলকাঠি নাড়লেন কে জানে, আর নয়নবাবুর সঙ্গে তো বন্ধুত্ব চলছে।

দেখা গেল মেস এর সবাই নিমাইকে ভালবেসে ফেলেছেন। তাই যাবার নামে জনে জনে দেখা করেন এবং সদুপদেশ দেন।

এমন কি কাংসকণ্ঠী সুখদা দরদী গলায় বলে, 'আহা মা-বাপ হারা ছেলেটা ছিল; আবার কোথায় ভাসতে গেল। ছেলে তো নয়, সোনার চাঁদ!

অতঃপর এই হলো—

যে গলির গণ্ডী থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করছিল নিমাই সেই গলি পার হবার সময় বারবার তার চোখটা ভিজে উঠতে লাগলো।

নিমাইয়ের মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে, পটলডাঙ্গার মেস এই ক'মাসেই তাকে অনেক পরিণত করে তুলেছে, মুখের এই নিতান্ত কমনীয় শ্রীটুকুর অনেকখানিকটাই হয়তো কেড়ে নিয়েছে, তবু গৃহকর্তা নিমাইকে দেখে অবাক হয়ে বলেন, 'এই মাষ্টার? এ যে নেহাত ছেলেমানুষ।'

বিনোদবাবু সশব্দ ঘোষণায় প্রতিবাদ জানান,—'কেন আমি তো বলেই ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তার বয়েস কি তিরিশ হবে?'

'তা নয়—কর্তা মলয়বাবু বলেন, 'ভেবেছিলাম গ্রামের ছেলে, হয়তো একটা পাশ করতেই বিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে!

চমৎকার! যে ছেলের একটা পাশ করতে বিশবছর লাগে, তাকে আপনি ছেলের শিক্ষক রাখতে চান মলয়বাবু?'

চোস্ত কথা শুনিয়ে দেবার চমৎকার একটি ক্ষমতা বিনোদবাবুর আছে।

মলয়বাবু লজ্জিত গলায় বলেন, 'তা, ঠিক নয়, মানে—'

বিনোদবাবু মনে মনে বলেন, মানে আমি খুব বুঝেছি। ভেবেছিলেন কালোকোলো গাঁট্টা গোঁট্টা একটা গাঁইয়া ছেলে পাবো, মাষ্টারকে মাষ্টার —চাকরকে চাকর হবে, পয়সা উসুল হয়ে যাবে। এই সোনার কান্তিটিকে দেখে মনটা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে। চাকরের কাজটা করাতে সমীহ আসবে ভেবে ভাল লাগছে না।

মুখে বলেন, 'মানের আর কিছু নয়। ছেলে তো আপনার বললেন ক্লাস থ্রি। তাও যদি পড়াতে না পারে, রাখবেন কেন? তবে আমার মনে হয় রেখে দেখলে ঠকবেন না।'

মলয়বাবু আরও কি বলতেন কে জানে, সহসা মলয়বাবুর কর্তার পোষ্টটা খতম হয়ে গেল। মঞ্চে প্রবেশ করলেন গৃহিনী।

ঘরের ভিতর থেকে নয়—বাড়ির বাইরে থেকে।

সকন্সা মার্কেটিঙে গিয়েছিলেন।

প্রবেশপথের মুখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন কোন একটি নাটক সুরু হয়ে গেছে।

বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার? বিনোদবাবু যে।'

'এই যে এই সেই ছেলেটি—'মলয়বাবু তাড়াতাড়ি বলেন, বিনোদ বাবু যার কথা বলেছিলেন খোকাকে পড়ানোর জন্যে।'

'আই সি।'

মায়ের আগে মেয়ে হেসে ওঠে, 'মাষ্টার মশাই, ওরে বাবা। দেখে ভয় লাগছে।'

নিমাই তাকিয়ে দেখে।

কলকাতায় এসে বাঙালী মেয়েদের অঙ্গে এই পোষাক দেখছে সে। পাঞ্জাবী মেয়েদের সাজ। সালোয়ার পাঞ্জাবী ওড়না। নামটা শিখেছে নিমাই জামার দোকানের বিজ্ঞাপনে, বাক্সের গায়ের ছবিতে।

মেয়েটার গায়ে সেই সাজ, তার সঙ্গে বাচালের মত হি হি হাসি।

মেস-এর তিন ভাঁজ গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই যেখানে সেখানে এই দৃশ্য দেখেছে নিমাই। গলায় ঝোলানো ওই ওড়নাটাকে আর মাথার বেনীদুটোকে সটপটিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হি হি করছে বুড়োধাড়ী মেয়েরা। হাসছে, ঘুগনি-ফুচকা কিনে খাচ্ছে, মনেও হয় না মেয়েমানুষ

তবু তারা রাস্তায় একা।

কিন্তু এই মেয়েটা?

কম করেও পনেরো ষোলো বয়েস হবে যার, সে তার বাবা মার সামনে, বাইরের দুটো ভদ্রলোকের সামনে এই রকম বাচালতা করছে।

কলকাতার অনেক দৃশ্যই তার অদ্ভুত লাগে। কিন্তু ঠিক এ রকম বিরক্তিকর লাগে না। আজ লাগলো।

আজ নিমাইয়ের মনে হলো, এই বাড়িতে থাকলে তো এই মেয়েটাকে সর্বদা দেখতে হবে ?

মলয়বাবুর গৃহিনী মেয়েকে একটু শৌখিন ধমক দিয়ে বলেন, মাষ্টার মশাই বলে এতো হাসির কি আছে, উনি তো আর তোমায় পড়াতে আসছেন না।—খোকাকে।'

'ও মাই গড্।' মেয়েটা জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে বলে, 'তবু ভাল। আমি ভাবলাম বুঝি আমার জন্যেই! মা আমাকে কেবলই ভয় দেখায় কিনা—বাপী বাঘা একটা মাষ্টার এনে দেবে তোর জন্যে।'

'একে দেখে কি তোমার খুব বাঘা মনে হলো মা লক্ষী ?'

বিনোদবাবু বলে ওঠেন, তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকবে না। তোমার ছোট ভাই পড়বে।'

'ভাল ভাল।'

মেয়েটা চলে যায় হাসির লহর তুলে।

গিন্নী গিন্নীর গলায় বলেন, 'ইনি আজ থেকেই থাকবেন বিনোদবাবু, এর জিনিসপত্র ঘরে তুলিয়ে নিচ্ছি।'

চাকরকে ডেকে আদেশ দেন।

চাকর এসে মালপত্রের নমুনা দর্শনে মুচকি একটু হেসে বলে, 'কোন ঘরে তুলবো ?

গৃহিণীরও অবশ্য সে দিকে তাকাতেই লজ্জা করছিল, তবু কড়া গলায় বলেন, 'সে কথাটা বলে দিতে হবে ? একটু বুদ্ধি খরচ করতে পার না ? যাও স্টোররুমের এক পাশে রাখোগে।'

বিনোদবাবু নিশ্চিন্ত চিত্তে চলে যান। সীতেশবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে ছেলেটার দায়িত্ব নেওয়ার ফলে মায়া পড়ে গেছে।

আশ্চর্য! নিজের মায়ার জিনিসগুলোর খোঁজ রাখিনা, অযথা পরের জিনিসে মায়া!

বিনোদবাবু দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান।

নিমাই এ বাড়িতে থেকে যায় 'দশচক্রে ভগবান ভূত'-এর মতো। কিন্তু এবাড়িতেই কি থাকতে পারবে নিমাই? নিমাইয়ের যেন গা ছম ছম করছে।

মেস থেকে অবশ্য চারদিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, চকচকে ঝকঝকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সব কিছু বেমানান লাগছে।

যেটা বিনোদবাবুদের মেসে কোনদিন হয়নি।

এদের ঘরে নিজের ট্রাঙ্কটা কী শ্রীহীন বিবর্ণ লাগছে। এদের ঘরে নিজের পুরাণো শতরঞ্চ জড়ানো বিছানাটা কী কুদৃশ্য মনে হচ্ছে।

নিজের জুতোটা কোন্‌খানে লুকিয়ে রাখবে ভেবে পাচ্ছে না।

এখানেও সেই বোকার মতই বসে থাকে নিমাই বিনোদবাবু চলে যাবার পর।

এই স্যারের ট্রাঙ্ক? হি হি হি।

সেই হাড় জ্বলানো মেয়েটা এসে দাঁড়ায় বেণী লটপট করতে করতে।

কবে কিনেছিলেন? লর্ড ক্লাইভের আমলে?

নিমাইয়ের আপাদমস্তক ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

নিমাই ঠিক করে—এ বাড়িতে কখনই নয়। এই বাচাল মেয়েটাকে সহ্য করা অসম্ভব।

তাই নিমাই আর রেখে ঢেকে কথা কয় না। আরক্ত মুখে বলে, আমি আপনাদের মতো বড়লোক নই।

বড়লোক হায় ভাগ্য! মেয়েটা অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে বলে, 'আমরা বড়লোক?···দেনার দায়ে বাবার 'মাথা খারাপ। মা জামা

সেলাই করে দোকানে বেচে আসে। আর পয়সার অভাবে আমার একটা মাষ্টারই রাখা হয় না।

মেয়েটা হাত দুটো উল্টোয় হতাশার ভঙ্গীতে।

নিমাইয়ের অবশ্য কথাগুলো আদৌ বিশ্বাস হয় না। এই বাচাল মেয়েটা নিশ্চয়ই সব বানিয়ে বলছে। এমন ঝকঝকে ঘরবাড়ি, এমন ভাল খাট-বিছানা আলমারি, জানালা-দরজায় এমন সুন্দর সুন্দর পর্দা, আর এরা বড়লোক নয় ?

মেয়েটা বলে, 'যাই বলুন, ট্রাঙ্কটা আপনাকে বদলাতে হবে। আর আপনার সাজটাও। এযুগে এই ধুতি শার্ট ? অচল !

নিমাই এই বয়সের একটা মেয়ের কাছে অপদস্থ হয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ভয় নেই, আমি আপনাদের এই শৌখিন বাড়িতে থাকছি না। আমার কিছু বদলাবার দরকার নেই !

'ওমা ! আপনি চটে যাচ্ছেন' ?

মেয়েটি হি হি করে হেসে বলে, 'পালাই বাবা। ভয় করছে।'

নিমাই অবাক হয়ে ভাবে, মেয়েটা কি পাগল ?

নিমাই দেখলো একা মেয়েটাই নয়, মেয়ের মাও পাগল।

নইলে তৎক্ষণাৎই তিনি ছেলের মাষ্টারকে 'সভ্য করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন।

দেখুন কিছু মনে করবেন না, আপনার ওই ট্রাঙ্কটা বাতিল করতে হবে। এই সুটকেসটা নিন, এতেই আপনার কাপড়-জামা রাখবেন।····এটা ঘরে ছিল, এখন কাজ চলুক। পরে নতুন কিনলেই হবে।····শুনুন, কিছু মনে করবেন না—আপনার ওই বিছানাটা আর খুলবেন না। কিছু মনে করবেন না—ওটা দেখে আমার চাকর হাসছিল। কলকাতার চাকর ভয়ানক সব 'বাবু' তো ! আপনার ঘর, বিছানা সবই আমি ঠিক করে দিচ্ছি—।

লজ্জায় নিমাইয়ের কান ঝা ঝা করে ওঠে। নিমাইয়ের মনের সামনে ভেসে ওঠে তার বিছানাটা। ঠাকুমার হাতে সেলাই করা

ফুল-লতা কাটা বড় কাঁথা, ঠাকুমার হাতে তৈরী পদ্মফুল আঁকা বালিশ ঢাকা।...নিজে হাতে কেচে ফরসা করে আনা চাদর-মশারি।

এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে হলো নিমাইয়ের, কিন্তু যাওয়া মানেই তো সেই বিনোদবাবুর মেস। আর ইতিমধ্যে নীতেশ মামাও এসে গেছে কি না কে জানে। তাছাড়া টাকার ঘরও তো শূন্য হয়ে এসেছে।

নিমাই তাই শুধু মাথা নীচু করে বলে, 'আমায়' 'আপনি' বলছেন কেন? আপনি কতো বড়ো।'

'তা হোক 'আপনি' না বললে, 'মাষ্টারমশাই মাষ্টারমশাই' ভাব আসে না।'

নিমাই ওই মহিলার কণ্ঠে তাঁর মেয়ের চাপল্যের আভাস পায়।

নিমাই তাই সাহস করে বলে ফেলে, বাঃ আমি তো আপনার মাষ্টারমশাই নই।

মহিলাটি ললিত ভঙ্গীতে হেসে ওঠেন, 'ভবিষ্যতে হতেও পারেন।

'কিন্তু আমার আসল ছাত্রটি কই?'

'সে তার পিসির বাড়ি গেছে। কাল আসবে। ভালই হয়েছে ইতিমধ্যে আপনি—' একটু ঢোক গিলে আবার বলেন, 'মানে ইতিমধ্যে আপনি বেশ 'মাষ্টারমশাই মাষ্টারমশাই' বনে যান। কাল সকালে আমার সঙ্গে দোকানে চলুন। উপযুক্ত কিছু...পোষাক... দরকার তো? এযুগে আপনার বয়সের ইয়ং ছেলে কখনো ধুতি-টুইলশার্ট পরে? পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরবেন।

সেই একই কথা।

নিমাইকে তাহলে এদের দৃষ্টিশূল লাগছে।

নিমাই আর কত চুপ করে থাকবে?

নিমাই ফস্ করে বলে বসে, 'এটা আপনার মেয়ে বলেছেন বুঝি?

'আমার মেয়ে ?'

মহিলাটি ভুরু কুচকে বলেন, 'কী বলেছে আমার মেয়ে ?'

'বলেছিলেন যে এই পোষাক বা ট্রাঙ্ক চলবে না—'

মহিলা হঠাৎ গুম্ হয়ে যান।

'এই সব বলেছে সে ? আর কি কি বলেছে ?'

নিমাই ভয় পায়।

ভয়ে ভয়েই বলে আর কিছু না। শুধু ওই কথাই।'

'ও! আচ্ছা ঠিক আছে।...বাপ্টিই—মানে আমার মেয়েই আমার কথা শুনে বলেছে। আমি বলছিলাম কি না আমার মার কাছে।'

নিজের ঘর দেখতে পায় নিমাই।

আধখানা সিঁড়ি উঠে নীচু ছাদের ছোট একটি ঘর। নিমাই দেখেছে গ্যারেজের উপর এরকম ঘর থাকে।

এ ঘরেও জানলায় পর্দা।

ছোট একটা বেতের টেবিল, একটা বেতের চেয়ার, আর রঙিন চাদর ঢাকা নীচু চৌকির বিছানা। এপাশে আলনা, দেওয়ালে গাঁথা আলমারি।

নিমাইকে এই ঘরটা দিল এরা।

তার মানে নিমাই জানালা দিয়ে বড় রাস্তা দেখতে পাবে, তার মানে নিমাই এখানে নির্জনে পড়তে পাবে।

একটা বাচ্চা ছেলেকে পড়িয়ে কুড়ি টাকা মাইনের উপর এইভাবে থাকতে আর হু'বেলা খেতে দেবে। এও যদি বড়লোকের ব্যাপার না হয় তো বড়লোক মানে কি ?

নিমাই তাহলে এখন কলকাতা শহরের একটি বড়লোকের আশ্রয় পেলো।

নিমাই তাই মনে করলো।

নিমাইয়ের কাছে বড়লোকের চেহারা এর থেকে বেশী এগোয়নি।

এই তিনতলা বাড়িটার যে এরা মাত্র একটা তলারই ভাড়াটে, তা খেয়াল করে না নিমাই। ভাবে সবই এদের। হয়তো আরো অনেক লোক আছে কোথায় না কোথায়। এই তো মহিলাটি বললেন, 'আমার মাকে বলছিলাম।'

সবই তো ভালো, শুধু যদি এই পাগল মেয়েটা না থাকতো! আর নিমাইকে সভ্য করবার জন্যে এতোটা ব্যগ্রতা না থাকতো!

ছেলেকে পড়াবে বৈ তো নয়।

ধুতি পরে পড়ালে জাত যাবে?

কর্তা একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বেড়াচ্ছেন দেখলাম বটে। তা বলে ধুতি কি মানুষ পরে না? বাঙালী বাংলা দেশের সাজে লজ্জা পাবে? আশ্চর্য।

তারপর নিমাই ভাবে আমার ভাগ্যটাও আশ্চর্য। বেশ স্বস্তিজনক একটা জায়গা পাব না? এলাম তো ওই জঘন্য মেস। আবার এলাম তো সাহেব বাড়ি!

নিমাই ভাবছিল।

মহিলাটি প্লেটে করে রসগোল্লা আর কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে এলেন।

'খান আমাদের খাওয়া-দাওয়া একটু দেরি হয়।'

নিমাই কুণ্ঠিত গলায় বলে, 'দরকার ছিল না। আমি তো খেয়েই এসেছি।'

'তা হোক। নতুন এলেন, একটু মিষ্টিমুখ করবেন।'

আপনি নিজে—নিমাই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো হতো।

'চাকর!'

মহিলাটির মুখটি একটু বিবর্ণ দেখায়। ও আবার আজই দেশে যাচ্ছে। মানে সেই যাকে দেখলেন। হঠাৎ দেশ থেকে চিঠি পেয়ে—'

তাড়াতাড়ি চলে যান ভদ্রমহিলা।

খোলা জানলা দিয়ে বড় রাস্তা দেখতে দেখতে রসগোল্লা মুখে দিয়ে ভাবে নিমাই—তা'হলে বড়লোকের বাড়ীর জীবনযাত্রা স্থরু হলো আমার।

শুধু আদরযত্নটা যদি একটু কম হতো। তা প্রথম দিনে যতটা করছে, ততটা বোধহয় থাকবে না। না থাকলেই বাঁচি।

আচ্ছা, মেয়েটা কি সত্যি পাগল ?

না বড়লোকের আহ্লাদী মেয়ে ?

বেয়াড়া বাচাল ?

কলকাতায় এসে অনেক শিখেছে নিমাই। অনেক কথাও।

ছাত্র আসে।

গেছো বাঁদর সমতুল্য বছর আট-নয়ের একটা ছেলে। ঘরে ঢুকেই সবকিছু যেন তচ্নচ করে দেয়। কথাবার্তাও তেমনি।

'বা-রে, আমাদের আলমারিতে বেশ নিজের বইটই সাজানো হয়েছে! খুব চালাক।'

তারপর বলে, 'তুমিই নতুন মাষ্টার মশাই ? তা তোমাকে পছন্দ হয়েছে। আগে যে ছিল, সে এমন কেলে বিচ্ছিরী—দেখলে রাগ হতো। আর দিদিমা যদি বলতো, 'কাঁচা কাপড়ে আমার পূজার মিষ্টি এনে দাও—', ও বলতো—'ওসব আমার কাজ নয়।'—

মা যদি বলতো, 'বাজারটা করে আস্থন তো—' ও বলতো—ছেলে পড়াবার কথা ছিল, বাজার করবার কথা তো ছিল না।'

ভাই-বোন দুটোই তবে সমান বাচাল!

নিমাই এই বাচালতার মধ্য থেকে নিজের কর্তব্যকর্মের পরিধিটা খানিকটা দেখতে পায়।

কিন্তু এই আদর যত্নের সঙ্গে ওই কথাগুলোর সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। এ তো বাবা কুটুম্বের মতো আদর! ঠিক আছে দেখাই যাক!

নিমাই ভেবেছিল দেখা যাক।

কিন্তু এমন অদ্ভুত একটা দেখা যে দেখতে হবে তা' জানতো না।

নিমাইয়ের ভাগ্যেই কি তাকে এত দেখাচ্ছে? না কি কলকাতার ভিতরের দৃশ্যই এই?

কর্তা-গিন্নী, ছেলে-মেয়ে, গিন্নীর মা—সবাই যেন আলাদা জগতের জীব। একে অপরের প্রতিপক্ষ।

তবে ছেলেটা মাষ্টারমশায়কে খুব ভজে ফেলেছে। ছোট্ট ছেলেটা যতই বেশী কথা বলুক, তবু রাগ হয় না। কিন্তু মেয়েটার কথায় যেন সর্বাঙ্গে আগুন ধরে যায়।

আসবে ও কখন?

হয় ভোরে, নয় ত সন্ধ্যার পর খোকাকে পড়িয়ে-পিটিয়ে সবে যখন নিজে পড়তে বসেছে নিমাই—তখন।

গুটিগুটি এসে পর্দা ঠেলে ঢুকবে।

প্রথমেই খানিক হিহি করে।নিয়ে বলবে, 'খুব পড়া হচ্ছে? কী ভাল ছেলে, উঃ!

নিমাই বোঝে, হয়ে গেল।

হতাশ গলায় বলে, আপনারও তো পড়া আছে।'

'আমার? হুঁ! আমি কি আপনাদের মতো ভাল ছেলে? আমরা হচ্ছি ওঁচা মেয়ে।'

'পড়ছেন তো ক্লাস নাইনে।'

ভাঁওতার জোরে। টুকে মেরে ক্লাশে উঠেছি।

'আমার টোকবার ক্ষমতা নেই। আমায় পড়তে দিন।

'মাথা খারাপ! আমি বলে কত কৌশল করে শ্রীমতী পারুলবালা দেবী এবং শ্রীমতী বেলারাণী দেবীর চোখ এড়িয়ে চলে এলাম একটু আড্ডা দিতে।'

নিমাই কঠিন গলায় বলে, 'এরকম করলে কেন? আমার খারাপ লাগে।'

বাল্টি ফোঁস করে উঠে বলে, আর যখন বেলারাণী গায়ে পড়ে গল্প করতে আসেন ? তখন তো খুব—

নিমাই বিরক্ত বিরক্ত অবাক গলায় বলে, বেলারাণী কে ?

বেলারাণী কে জানেন না ? বাল্টি হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'আছেন কোথায় ? এ বাড়ির গৃহিণী—আমাদের মাতৃদেবী !'

গাঁইয়া নিমাই এই অসভ্যতায় বিচলিত হয়।

ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'মার নাম ধরছেন ?'

'ওমা ! ধরলে কী হয় ? আমরা তো মাকে নাম করেই ডাকি।'

মাকে নাম করে ডাকেন ?

'হ্যাঁ'। বাল্টি অবলীলায় বলে, দিদিমা বলে বেলারাণী, আমারাও বলি বেলারাণী।'

আপনার মা বকেন না ?

'বকবে কেন ? হি হি হি—' ওড়নাটায় একটা ঝাপট মেরে তাকে পিঠে পাঠিয়ে দিয়ে বলে ওঠে বাল্টি, বরং 'মা' বলাটাই পছন্দ করে না। পছন্দ করবে কেন ? 'মা' বলে ডাকলেই তো সবাই বুঝে ফেলবে—এতোবড় মেয়ের মা।...হি হি হি...আপনি একবার 'মাসীমা' ডেকে দেখুন না ! চাকরী যাবে। ঝি-চাকররা দিদিমাকে মা বলে, মাকে দিদিমণি।

'ঠিক আছে। যার যা ইচ্ছে সে তা করবে—' নিমাই গম্ভীর গলায় বলে, 'এবার আপনি যান, আমায় পড়তে দিন।'

দেখুন কেউ বই নিয়ে বসে আছে দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আপনি বলেছেন, যার যা ইচ্ছে করবে—আমার ইচ্ছে এখন গল্প করা।'

নিমাই হতাশ গলায় বলে, আচ্ছা আপনি কি চান যে আমি এখান থেকে চলে যাই ?

'বাঃ' সে কী।'

এবার বাল্টি একটু অনুতপ্ত হয়। বলে, 'আপনি সত্যিই রেগে যাচ্ছেন। তবে যাই।'

তখনকার মতো চলে যায়, আবার কোনো সময় আসে। টুক্ করে পর্দা ঠেলে ঢুকে বলে, 'ডিসটার্ব করবার জন্যে মাপ চাইছি—'

তারপর জাঁকিয়ে বসে বলে, 'বাবা আজ আপনাকে সঙ্গে করে বাজার করতে নিয়ে গেল, তাই না?

'আজ ছুটি হি হি হি—রোজ ছুটি হয়ে থাকবে না নিশ্চয়? কিন্তু বাজার যাওয়াটা চলবে!'

'তা যদিই চলে' নিমাই বলে দোষ কি? চাকর দেশে গেছে, বাড়ির লোক করে না কাজ?'

'চাকর দেশে গেছে? হি হি হি-হি…তাই বুঝিয়েছে বুঝি আপনাকে? আগে থেকে তো চাকরকে জবাব দিয়েই রেখেছিল। বলেছিল, দুটো লোককে পোষা যাবে না। মাস্টারই বাজার দোকান করবে তা মজা হয়েছে কি—' বাল্টি চোখে মুখে ভয়ঙ্কর কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে বলে, আপনাকে দেখে মার গিয়েছে মন ঘুরে। মানে গাঁইয়া হলে কি হবে, চেহারাখানা তো আপনার বেশ রাজপুত্তুর রাজপুত্তুর! সভ্য করে নিলেই হয়ে গেল …তা করে এনেছে। দিব্যি করে এনেছে, এখন আর সেই গাঁইয়া ছেলেটি বলে চেনাই যায় না…এঘরে তো একটা আর্শিও নেই ছাই। কী ছাই যত্ন করছে মা আপনার!'

কথা বলে, যেন মেল গাড়ী চালায়।

চমকে আর থামতে পায়না নিমাই, বারে বারেই চমকাতে হয়।

মেলগাড়ী চলতেই থাকে, 'তা এখন আমার মার বাবার সঙ্গে রোজ তুমুল কলহ 'ও কেন পড়ার ক্ষতি করে বাজার করবে, ও ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, এভাবে সময়ের অপচয় করলে—অথচ আবার

বাবা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'কেন ? এসব কথা কি ছিল না ? অনন্তকে তবে ছাড়ানো হলো কেন—আমি বাজার করবো বলে ?'

মা বলে, 'কর না ক্ষতি কি ? বসেই তো আছো।' তখন ছি ছি ...তখন বাবা রেগে টেগে বলে, 'কেন নিয়ম টিয়ম উল্টে যাবে কেন? মাষ্টারের চেহারাখানি সোনার গৌরাঙ্গর মত বলে ?' ব্যস ! লেগে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।'

'আপনাদের বাড়ির ভিতরকার গল্প শোনবার দরকার নেই আমার ! এসব আর বলবেন না।'

'বেশ বলবো না। তবে বড় আরশি নিয়ে দেখবেন একবার নিজেকে। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে, চুলের কায়দায়, চটির বাহারে কেমনটি লাগছে আপনাকে !'

এই রকম কথার মধ্যে হঠাৎ এক-এক দিন বেলারাণী এসে ঢোকেন।

'তুই এখানে কী করছিস ?'

'কী আর করবো আড্ডা দিচ্ছি।'

'এইটা আড্ডা দেবার সময় ? লেখা পড়া নেই তোমার ? তোমারও আছে, মাষ্টার মশায়েরও আছে।'

'আমি, আমি শুধু বলছিলাম, মাষ্টার মশায় আপনার আরশি নেই ? আরশিতে বেশ ধরা পড়তো কেমন দেখতে আপনি। কী মার্ভেলাস্ চাউনি ! দাঁড়ানো চেহারা দেখবেন। দেখবেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে কেমন দেখাচ্ছে।'

বেলারাণী যে মেয়েকে এঁটে উঠতে পারেন না, তা' বোঝা যায়। তাই বেলারাণী হালকা গলায় বলেন, অন্য পোষাক পরলে সকলকেই অন্য রকম দেখায়। যাও বাজে কথায় মাথা না ঘামিয়ে তু'পাতা পড়গে তো। রামকাঁচা !'

'ইংরেজীতে তো রামকাঁচা ! বুঝিনা সুঝিনা ভাল লাগেনা।'

বেলারাণী বলেন, 'তা বাপের কাছে একটু বুঝে নেওয়া যায় না? মাষ্টারমশাইয়ের কাছে একটু বুঝে নিলেও তো পারিস।'

'বাবা? বাবা আমায় পড়াবে? তা, হলেই হয়েছে। ততক্ষণ বাবার ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল করলে কাজ দেবে।'

'নিজে বোঝবার চেষ্টাও তো কর না? এই তো মাষ্টার মশাই। পড়ছেন তো? ওর পড়া কে দেখাচ্ছে? বরং উনিই খোকাকে—'

তাই সবাই যদি মাষ্টারমশাইয়ের মতো মহাপুরুষ না হয়—' বলে চলে যায় বাপ্টি।

তখন বেলারাণী নিমাইকে নিয়ে পড়েন।

নিমায়ের এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না, খাওয়া দাওয়ার কোনো ইয়ে হচ্ছে কিনা। মানে অনেকে তো ঝাল-মশলা খেতে পারে না, বেলারাণীর বাড়ির রান্না 'রিচ, অতএব—ইত্যাদি প্রভৃতি।

নিমাই সব কথাতেই 'কী যে বলেন, কী আশ্চর্য! এখানে অসুবিধে? ইত্যাদি উত্তর দিতে থাকে, এবং মনে মনে ভাবে মেয়ের চেয়ে মাও কম যাবে না। পড়ার সময়টাই যদি এভাবে নষ্ট হয়, তবে আমার এখানে থেকে লাভ?

অথচ 'এখানের আরাম আয়েস সুখ-সুবিধেগুলো প্রায় কব্জায় এনে ফেলেছে নিমাইকে।

ক্রমশঃ যেন আর ভাবতেও পারছে না নিমাই এখানটা ছেড়ে অন্য কোথাও থাকা যায়।

কিন্তু সমস্ত সুখের মধ্যে এ কী অশান্তি!

'আপনি আমায় 'মাষ্টার মশাই বলবেন না, ভীষণ লজ্জা করে।'

'বাঃ লজ্জা কিসের? আমার বলতে বেশ ভাল লাগে।'

'তা হোক। আপনি আমার নাম ধরেই বলবেন।'

দেখি। একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

পরের দৃশ্যে বাপ্টি এসে বলে, 'কেন মিথ্যে ওসব বলেন?

বেলারানী আপনাকে নিমাই বলে ডাকবে না। ডাকলে পাছে—আপনার ছোল ছেলে ভাব এসে যায়! ফ্রেণ্ড ফ্রেণ্ড ভাব করুন, মার্কেটের সঙ্গী হোন, সিনেমায় নিয়ে টিয়ে যান, তা' নয়—আমায় নাম ধরে ডাকুন।' বেজায় বোকা আপনি। বুদ্ধি থাকলে, এবাড়িতে অনেক প্রতিপত্তি করে নিতে পারতেন।'

ছি ছি করে পালায়।

নিমাই অবাক হয়ে ভাবে এসব কোন ধরণের কথা? যেন ভিতরে কিসের একটা ইশারা!

সর্বাঙ্গে কাটা দিয়ে ওঠে নিমাইয়ের।

জোর করে ভাবতে চেষ্টা করে—মেয়েটা পাগল?

কিন্তু মা-টি?

তাঁকেও তাহ'লে তাই বলতে হবে?

ক্রমশঃ যেন মেয়ের থেকে মাকেই বেশী অস্বস্তিকর মনে হয়।

যেন কোথায় অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর সেই ঝড় বৃষ্টির রাতটা—ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে নিমায়ের উপর।

ওদিকে খাবার সময় দিদিমা চুপিচুপি বলেন, সকালে চানের পর আমার ঠাকুরের একটু মিষ্টি এনে দেবে দাদা?···মকরধ্বজ ফুরিয়ে গেছে, জামাইকে বলে বলে হতো হয়ে গেলাম, এলোনা। এনে দেবে দাদা? বোনঝিকে এই চিঠিখানা লিখেছি, মেয়ে বলে খাম নেই, একটা খাম কিনে ডাকবাক্সে ফেলে দেবে দাদা?'

দাদা দাদা দাদা!

অসংখ্য অনুরোধ। চুপি চুপি টিপে টিপে।

'দাদা শব্দটায় প্রথম প্রথম মনের মধ্যে ভয়ানক একটা আলোড়ন উঠতো নিমাইয়ের, ঠাকুমার কণ্ঠস্বরটা কানে বাজতো। ব্যস্ত হয়ে অনুরোধগুলো পালন করতো। কিন্তু ক্রমশঃই অনুরোধের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ এদিকে পকেট শূন্য।

মলয়বাবুও যে বলেন, 'বাজারটা এখন করে আনো নিমাই বাবু, পরে দিয়ে দেব।'

বেলারাণী টের পেলে রসাতল করেন। বলেন, 'খবরদার, তুমি মাষ্টার মশাইকে দিয়ে বেগার খাটাবে না। পয়সা না ঠেকিয়ে বাজারের হুকুম?'

মলয়বাবু তখন মিনমিনিয়ে যান। বলেন, আর এই যে জামা প্যান্ট-জুতো সাজসজ্জা, সাবান পাউডার, এসব সংসার থেকে হচ্ছে না?'

'হবেই তো। ছেলের মাষ্টার হয়ে, ভূত হয়ে বেড়াবে?'

'ভূত হওয়া আর বাবু হওয়া এক নয়।'

অবশ্যই এসব কথা নিমাইয়ের আড়ালে হয়। তবু নিমাইয়ের কানে এসে পৌঁছায়।

খোকা এসে খবর সরবরাহ করে।

জানো? বাবা বলে মাষ্টারকে তুমি বাবু করে তুলছো। গরীবের ছেলেকে বাবু করে তুললে তার ক্ষতিই করা হয়। মাষ্টার মশাই, তুমি গরীবের ছেলে?'

নিমাই আস্তে বলে হঁ্যা গরীবের ছেলে। তাই ভাবছি আর বাবু হব না। এবার চলে যাবো।'

'না। তুমি চলে যাবে না।'

'যেতেই হবে ভাই।'

যেতেই হবে।

এই চমৎকার ছোট্ট সাম্রাজ্যটুকুর আধিপত্য ছেড়ে যেতেই হবে চলে। স্বস্তি শান্তি নিশ্চিন্ততা বোধকরি নিমাইয়ের জন্য নয়।

নিমাই এদের গৃহবিবাদের কারণ হতে চায় না। তা'ছাড়া মাইনেটা কই? নিয়মিত নেই। বিলাসিতার উপাদান হাতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু কলেজের মাইনে দিতে চিন্তায় পড়ছে।

এই গোলমেলে জীবনের মধ্যে খাপ খাওয়াবার ক্ষমতা নিমাইয়ের নেই।

নিমাই তাই প্রাণপণে কর্মখালির বিজ্ঞাপণ দেখে।

যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত, শুধু পড়াটা যাতে হয়।

অবশেষে ডাক আসে একটা।

একটি বৃদ্ধলোককে বই পড়ে শোনাতে হবে। কারণ চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন তিনি।

বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ও কিছু হাত খরচ।

সেই কাজটা কেমন তাই জানতে যায় নিমাই।

নিমাই ঢুকতে গিয়ে থতমত খায়!

এওতো বড়লোকের বাড়ী।

নিমাইয়ের বিধাতা কি নিমাইয়ের সঙ্গে কেবল ব্যঙ্গই করে চলবেন? গৃহস্থ বাড়িতে খুব সাধারণ একটা কাজ হয় না তার?

নিমাই ভুল করে।

নিমাই খেয়াল করে না, বড়লোক ভিন্ন এমন খেয়াল কার হয়—যে শুধু বই পড়ে শোনাবার জন্যে এতো পয়সা খরচ করতে চায়।

কিন্তু এই বাড়ি, যে বাড়ির সমস্ত মেজে আগাগোড়া ফুল কাটা, আর সেই মেজেতেও জুতো দিয়ে হাঁটবার জন্যে কার্পেট পাতা, যার ঘরে ঘরে ডানলোপিলোর সোফা পাতা, সে বাড়িতে নিমাই ঘুরে বেড়াবে?

'কাল কথা দেব।'

'কাল কথা দেবে?'

বৃদ্ধ যেন অসহায় ভাবে বলেন, 'এতে আর ভাববার কি আছে বাপু? ঘরের ছেলের মতো থাকবে, নিজের পড়াশুনো করবে, আর সকাল সন্ধে দু'বেলা আমায় পড়ে টড়ে শোনাবে।'

না, ভাবনার কিছু নেই সত্যি, কিন্তু ওই 'ঘরের ছেলের মতো' শব্দটাই যেন ভয়ের।

বৃদ্ধ চোখে ভাল দেখেন না—তবু মোটা চশমার মধ্যে থেকে চোখ তুলে তুলে বলেন, 'তুমি তো বাপু নেহাৎ ছেলে মানুষ। বাড়িতে কেউ নেইও বললে, তবে ভাবনা কিসের ?

নিমাই মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, 'মানে আমি লেখাপড়ার জন্যে একটু নির্জনতা চাই—'

'কী আশ্চর্য! সেটা পাবে না কে বললো? ইচ্ছে করলে তুমি এই বাইরের দিকেরই কোনো একটা ঘরে থাকতে পারো। বাড়িতে আর আমার কে আছে? ছেলে-বৌ নিজের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের ছেলেমেয়েরা তো এই বুড়োর দিকও মাড়ায় না।' বৃদ্ধ গলা খাটো করে বলেন, 'যখন এই বুড়োর ক্ষমতা ছিল, তখন নাতি-নাতনিরা কাছে আসতো। এখন অন্ধ খঞ্জ হয়ে এক পাশে পড়ে আছি। কার আর ভাল লাগে বল? একটা দূর সম্পর্কের নাতনী ছিল। মানে ভাগ্নীর মেয়ে, সেই মেয়েটাই মায়া-শ্রদ্ধা করতো। বই-কাগজ পড়ে শোনাতো, ডিকটেশান দিলে লিখেও দিতো। আমার আবার একটু লেখা টেখারও বাতিক আছে কি না। তা মুস্কিল হতো কিন্তু, মেয়েটা ইংরাজী টিংরাজী ভালো জানতো না। অসুবিধে হতো। মানে, বুঝতেই তো পারছো, মা-বাপ মরা গরীবের মেয়ে, কেই বা পড়িয়েছে। নেহাৎ নিরাশ্রয় বলে এখানে আশ্রয় নিতে—তা আমার ছেলে-বৌ তো তাকে মানুষ বলেই গণ্য করতো না। চোখে না দেখতে পেলেও, মনের একটা চোখ তো আছে? কষ্ট দেখে মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিলাম। সত্যি তো আর আমার নার্সগিরি করবার জন্যে তাকে চিরকাল আটকে রাখতে পরি না? তারও মান সম্মানের ওপর রাখবার হাত আমার নেই।'

নিমাই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে এই সব পারিবারিক কথায়। অথচ এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে তো বলে উঠতে পারে না, 'আপনার ঘরের কথা আমায় বলতে এসেছেন কেন?'

পারা সম্ভব নয়। তাই বেচারী বসে বসে ঘামতে থাকে।

বৃদ্ধ তেমনি খাটো গলায় বলতে থাকেন,-বিয়ে দিয়ে দিলাম খরচা পত্র করে। তাতে আমার ছেলে বৌয়ের কি গোঁসা: বুঝলে এতো আছে তবু এতোটুকু ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। আমি অবশ্য ওই সব অনিচ্ছে টনিচ্ছে গ্রাহ্য করি না। এ সমস্তই আমার স্বোপার্জিত। হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতাম, বুঝলে ? ঝাঁকার ওজনে রোজগার করেছি, পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করি নি, রাজার হালে রেখেছি ছেলে মেয়েদের। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছি ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা করে খরচা করে। সে সব কথা যেন ভুলেই গেছে সব ব্যাটা ব্যাটি যেন বাপটা চিরকালই এই রকম অন্ধ খঞ্জ ছিল। বাড়ির গিন্নী চলে গেলেন বৌমার আমল পড়লো। সংসার অন্য রকম হয়ে গেল। পুরনো চাকর-বাকরগুলো বিনা দোষে বিতাড়িত হলো। নতুন মহারাণীর আমলে সব নতুন প্রজা।

নিমাইয়ের বুঝতে বাকী থাকে না। পড়ে-টড়ে শোনানোর কাজটা তার গৌণই হয়ে দাঁড়াবে—মুখ্য হবে শোনা। এই দৃষ্টিহীন এবং পত্নী হীন বৃদ্ধের আক্ষেপোক্তি শোনা।

কী অস্বস্তিকর।

কিন্তু আশ্চর্য। ইনি একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি: একদা জীবনে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু এ কী অদ্ভুত মানসিক দৈন্য। নিমাই একটা তুচ্ছ ছেলে—একেবারে রাস্তার লোক বললেই হয়, মাত্র এই মিনিট কয়েকের পরিচয়, এমন কি ভদ্রলোক ভালো দেখতেও পাচ্ছেন না নিমাইকে। অথচ উজাড় করে এই ঘরের কথা বলে চলেছেন ওর কাছে। কারণ মাত্রও নেই। নিমাই এর আত্মীয় নয় যে, তার সামনে অকৃতজ্ঞ পুত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে জব্দ করবেন পুত্রকে ······নিমাইয়ের কাছে প্রতিকারের কোনো প্রত্যাশা নেই। তবু—

নিমাই অবাক হয়, অন্যমনস্ক হয়।

ভদ্রলোক কিন্তু বলেই চলেছেন। 'হ্যাঁ সেই বিয়ের খরচা নিয়ে

কী রাগারাগি। আমিও শুনিয়ে দিলাম, কারুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে করতে যাই নি আমি। আমার টাকা আমি যা খুশী করবো। কেন করবো না বল ? ওরা কি আমার সুখ দুঃখ দেখেছে যে, আমি ওদের ভবিষ্যতের সুখ দুঃখের কথা ভাবতে যাবো ? কষ্ট পায় বয়ে গেল। তবে কষ্ট পেতেই বা যাবে কেন ? কম সম্পত্তি কি করেছি আমি ? ঢের আছে। তবু এই যা বললাম—এক পয়সাও ছাড়তে রাজী নয়। আসলে মানুষ হচ্ছে কুমীরের জাত। সর্বস্ব গ্রাস করতে চায়। লোভই লোভ শেষ করেছে মানুষকে।....এই যে দেখো না, তোমার মাসে মাসে একশোটা করে টাকা দেব শুনে বৌমার আমার কি ছটফটানি ! বলে কি না, 'ও বাবা, আপনি বরং আমায় ওই মাইনেটা দিয়ে রাখুন, আমিই দু'বেলা আপনাকে কাগজ পড়ে শোনাবো।.... হুঁ, আমি ওই কথায় গলবো এমন কাঁচা ছেলে নই। পড়ে শোনাবো তো কতো। মাঝের থেকে আমার একটা সুব্যবস্থার পথ বাতিল হয়ে যাবে।'

আচ্ছা আজ আমি উঠি।'

বললো নিমাই।

'আহা আজ তো উঠবেই। কিন্তু কথাটা দিয়ে যাও। তোমার মত কম বয়সী একটি ছেলেই আমার দরকার, যার ঘর সংসার নেই। মাসখানেক এক স্কুলমাষ্টার ছিলেন, একমাসের মধ্যে ষোলদিন কামাই। কী না আজ ছেলের অসুখ, কাল মেয়ের পরীক্ষা, পরশু আত্মীয়; বিয়োগ,—অসহ্য। অথচ মাষ্টার ব'লে একশোর ওপর আরো পঁচিশ। বলছি, না সংসারী লোক নয়, স্টুডেণ্টই ভালো যার টাকার দরকার, থাকার দরকার ! তা তুমি আর দ্বিধা করো না, বুঝলে ? কাল থেকে লেগে যাও। শোনো তাহলে খুলেই বলি, একটা বড় জিনিস নিয়ে কাজ করছি—মানে রিসার্চ। ব্যাপারটা হচ্ছে মহাভারতের যুগের 'ল', সংহিতকারদের 'ল', বর্তমান যুগের 'ল'—এই তিনটের একটা তুলনামূলক আলোচনা ! অনেকখানি

এগিয়েছিলাম। ভগবান চোখের আলোটা কেড়ে নিয়ে মারলেন। যাক পরের আলো ধার করেই ওটা শেষ করে যাবো। দেখিয়ে দিয়ে যাবে। সমাজ-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ——'

হটাৎ থামলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গলা ঝেড়ে বললেন, 'কে ওখানে ?'

নিমাই অবাক হলো।

নিমাই তো টের পায়নি ভিতর দিকের দরজায় একটা চাকর এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ উনি পিছন দিক থেকেই বুঝে ফেললেন। বাইরের ইন্দ্রিয় লুপ্ত হলেই যে ভিতরের ইন্দ্রিয় তীব্র হয়ে ওঠে এটা সত্যি !

চাকরটা বললো, 'আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।'

বৃদ্ধ প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হয়েছে তো হয়েছে। থাক্ এখন ! ওষুধ খাওয়া না হাতি। পাহারা দিতে এসেছে বাবু এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা কইছে। যা' বলগে যা বৌমাকে—পরে খাবো !

নিমাই এই অবসরে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। উনি আবার বলেন, দেখলে তো ? সর্বদা পাহারা। ওদের ধারণা কানা অন্ধটাকে ঠকিয়ে কে কখন সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায় ! তোমায় বলবো কি, একদিন বেলুড়ের এক স্বামীজী এসেছিলেন। মানে আগে যেতাম টেতাম। এখন আর যেতে পারি না, তাই স্নেহ বশতঃ এসেছেন—শুনলে বিশ্বাস করবে ? আমার ছেলে-বৌ সেখান থেকে এক মিনিটের জন্যে নড়লো না। যেন কতই ভক্তি। আসলে কি জানো ? পাহারা। পাছে স্বামীজী আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যথা সর্বস্ব মিশনের নামে লিখিয়ে নেন '—নিজেরা যে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, আমি যে রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসতেও পারি, এ জ্ঞান তো টনটনে আছে।—স্বামীজী চলে যেতে, বৌমার আমার সেধে সেধে কতো কথা বলা, 'আহা কি চমৎকার কথা বলেন। উঠতে ইচ্ছে করেনা। 'আমি কচি খোকা ?'

নিমাই ভেবে পায়না, যে মানুষ তিন যুগের আইন নিয়ে তুলনা-মূলক আলোচনায় বিরাট গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনায় মসগুল থাকতে পারেন, সেই মানুষই কেমন করে পারেন এই সব অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র কথায় নেমে আসতে। আসলে মানুষের মনটা কী? কে জানে হয়তো মৃগাঙ্কর ঠাকুমাও উচ্চ চিন্তা করেন, হয়তো বৈষ্ণব ধর্মের রসে আপ্লুত হয়ে 'জীবে প্রেম'-এর কথা কেন।

মানুষের মাপকাঠি কোথায় কে জানে?

এবার নিমাই না বলে পারে না 'এসব কথা আমি কি বুঝবো? আমি তো কাউকেই চিনি না।'

বৃদ্ধ ঈষৎ লজ্জিত গলায় বলেন, 'তা ঠিক। আজই তোমার এসব—তবে চিনবে। দুদিন থাকলেই চিনতে পারবে কে কেমন চীজ্!'

উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ভুলে আবার কথা জোড়েন তিনি, 'আসল কথা, এখনো যে এই বুড়ো বেঁচে থেকে খরচ করছে, এটা বাবুদের পছন্দ হচ্ছে না। মনে ভাবছে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কমে যাবে। আরে বাবা কলসীটা ভরলো কে? তা সেটা ভাবে না! বাবা সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবে এই চিন্তা! এখন বসে বসে বুড়োর মরণ টাঁকছে, বুঝলে?'

নিমাই প্রতিবাদের গলায় বলে, 'এসব আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি ভায়া, ঠিকই বলছি।···ভায়াই বলি! নাতির বয়সী যখন। আমার বড় মেয়ের ছেলে—'

কথায় আবার ছেদ পড়ে।

দরজায় আর এক আবির্ভাব।

চাকর নয় কর্ত্রী। হাতে জলের গ্লাস!

'মহারাণী' বিশেষণের যোগ্য বটে!

দীর্ঘাঙ্গী, বয়েস চল্লিশ মতো। তিনি নিমাই নামের মানুষটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই ঘরে এসে বলে ওঠেন, 'বাবা, আজ কিন্তু

আপনি ভারী দুষ্টুমী করছেন। ওষুধ খেতে কতো দেরী করছেন বলুন তো? খেয়ে ফেলুন।'

একটি বড়ি ও জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেন।

নিমাই অবাক হয়।

এই মহিমময়ী ও স্নেহময়ী সম্পর্কে এতক্ষণে এতো কটূক্তি জানিয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। পাগল না কি?

কিন্তু পাগলই বা বলা যায় কি করে?

পাগল কি মুহূর্তে সুর ফিরিয়ে নিতে পারে?

বৃদ্ধ তো পারলেন।

ওই স্নেহ আদর আর আবদার মিশ্রিত কণ্ঠের উপযুক্ত সুরেই উত্তর দেন, 'কেন দুষ্টমী করবো? মা নিজে না এলে কি ছেলে খায়?' বলে বড়িটা টপ করে গিলে ফেলেন।

নিমাই কি স্বপ্ন দেখছে?

না মঞ্চের অভিনয়?

এ বাড়িতে টিকতে পারবে নিমাই? পারা সম্ভব?

আসলে কে দোষী?

ওই অসহায়-মুখ বৃদ্ধ? না ওই মর্যাদাময়ী মহিলাটি?

বৃদ্ধ এবার আরো বিগলিত গলায় বলেন, 'এই দেখো বৌমা, আমার নতুন কর্ণধার।'

'বলুন আপনার কর্ণের জন্য ধারা-বিবরণী-কার।' বলে মৃদু হাসেন বৌমা।

বৃদ্ধ বলেন যা বলো। সেই মাস্টারের মতো নিত্য কামাই করবে না, এখানেই থাকবে। নিজের পড়াশুনো করবে আর অবকাশ মতো এই বুড়োটার পাগলামীর ভার নেবে। বলে হাসতে থাকেন বৃদ্ধ টেনে টেনে।

মহিলাটি এখনো নিমাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে—'আজ থেকেই থাকবেন?

'না না, আজ থেকে নয়—'বৃদ্ধ ব্যস্ত গলায় বলেন, 'কাল থেকে—কাল থেকে। ইনি আবার বলেছেন 'ভেবে দেখি'। আমি বলি আরে বাবা ভেবে দেখবার কি আছে? ঘরের ছেলের মতো থাকবে, আমার বৌমার কাছে আপন পর নেই। সবাইয়ের জন্যে সমান ব্যবস্থা। সবাইয়ের প্রতি সমান যত্ন। কাল থেকেই চলে আসবে তুমি বুঝলে?

বৌমা রেজাল্টটা না শুনেই গেলাশটা নিয়ে চলে যান।

নিমাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বৃদ্ধ আবার গলা নামান, বলেন, 'দেখলে তো কায়দা, 'যেন বুড়ো শ্বশুরের জন্যে মরে যাচ্ছেন।'

নিমাই মনে মনে বলে, কায়দা আপনারও কম দেখলাম না। কে যে বড় অভিনয় শিল্পী তা বোঝা কঠিন। অথবা আসলে তুমিই। ওঃ আশ্চর্য।

বৃদ্ধ কিন্তু নিজের ব্যবহারের হাস্যকর দিকটা দেখতে পান না, তাই বলেন প্রথম দিনেই একটু ইয়ে করে দিলাম, যাতে তোমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দেন।'

নিমাই আর দাঁড়ায় না।

'আচ্ছা আজ তবে আসি—'বলে চলেই যায়।

বাইরে বেরিয়ে আর এক বিপত্তি।

বৃদ্ধের পুত্র কোথা থেকে যেন ফিরলেন। গাড়ি থেকে নেমেই গট গট করে প্রশ্ন করলেন,—'আপনি?'

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, তবু আপনি করেই বলেন নিমাইকে।

নিমাই শান্ত গলায় সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দেয়। পুত্র ভুরুটা কুঁচকে বলেন, ওঃ বাবার ডাক্তার।

ডাক্তার।

নিমাই অবাক হয়ে তাকায়।

'তা' ডাক্তারই। ম্যানিয়াগ্রস্ত লোকের পক্ষে তার ইচ্ছাপূরণই ডাক্তারী। তা কতো মাইনে ধার্য হলো?'

নিমাইয়ের ফর্সা মুখটা লাল হয়ে ওঠে। এমন বাড়িঘর, এমন সৌম্যকান্তি চেহারা অথচ কি রকম রূঢ়। অমার্জিত অশালীনতা কাকে তবে বলে?

নিমাই গম্ভীরভাবে বলে, 'একশো।'

'একশো। অবশ্যই গ্রাস খাওয়া দাওয়া থাকা। মানে পেপারে তাই দেওয়া হয়েছিল মনে হচ্ছে।

নিমাই চুপ করে থাকে।

ভদ্রলোক যেন অনুকম্পার গলায় বলেন, 'ঠিক আছে। লাক্ যখন আসে। তবে আপনি কি মনে করেন একশো টাকার মতো কাজ আপনি করতে পারবেন?

নিমাই এখন আর সদ্য গ্রাম থেকে আসা নয়। নিমাইয়ের মনের সেই অনিন্দ্য শুভ্রতায় মালিন্যের স্পর্শ লেগেছে এখন, তাই নিমাইয়ের মনের মুখ কথা কয়ে ওঠে, মাসে একশো টাকা, তার মানে দৈনিক তিন টাকা চার আনা। একটা মজুর মিস্ত্রীর রোজের থেকেও কম। অথচ বললেন, বাবার ডাক্তার। তা ওঁর বাবার দানটাও কি এতো কম যে মনে হচ্ছে উসুল হবে না?

কিন্তু মুখে তো বলা যায় না ওকথা।

তাই শান্তভাবেই বলে, 'কাজটা তো দেখিনি এখনো! আর ধার্য্য তো আগে থেকেই করা ছিল বিজ্ঞাপনে।'

'হুঁ, টিকতে পারলেই ভালো। দেখবেন অনেক রকম বাতিক। শুধু বই পড়িয়ে শুনবেন না, বই লিখিয়ে ছাড়বেন। দেখবেন।'

নিমাইয়ের বুঝতে বাকী থাকে না নিমাইকে ভয় পাইয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ভদ্রলোকের। একটু আগেও নিমাই ভাবছিল কাজটা নেবে কিনা। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে জেদ চাপে ওর। ভাবে, ওঃ তুমি ভাবছো আমি ভয় পেয়ে পালাবো? তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে

দিচ্ছি না। নাঃ, বুঝতে পারছি আসল পাপী তোমরাই। আচ্ছা ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে আমিই দেখবো। আমিই ওঁর সহায় হবো।

তাই বলে, 'দেখি।'

হ্যাঁ দেখুন। যদি বণ্ডে সই করে না থাকেন। উনি আবার তাও করাতে চান কি না।....থাকেন কোথায় ?

নিমাই আস্তে অথচ দৃঢ় গলায় বলে 'দরখাস্তয় আমার নাম ঠিকানা সব লেখা আছে।'

ওঃ! ভদ্রলোক মুখ কালি করে গাড়ি গ্যারেজে তুলতে যান।

নিমাই কি ইতিপূর্বে আর কাউকে এমন কোনো কথা বলেছে, যাতে তার মুখ কালি হয়ে যায় ? বলেনি। অথচ আজ বললো। তার মানে এই গোলমেলে বাড়িটায় ঢোকবার আগেই নিমাইয়ের মাথাটা গোলমেলে হয়ে গেল। নিমাই নিজের প্রকৃতির বিপরীত কাজ করে বসলো।

আর তাতে যেন আনন্দই পেল নিমাই।'

আশ্চর্য বৈ কি ; নিমাই কি বদলে যাচ্ছে ?

ভেবে ভেবে কুল পায় না।

... .

এখানে তো তবু মানুষগুলোকে জানা হয়ে গেছে কিন্তু নতুন সেই জায়গাটা ?

যেখানে একটি দৃষ্টিশক্তি হারানো বৃদ্ধ মুহূর্তে নিজেকে পালটে নিয়ে কুটিল চেহারাকে সরল চেহারা করে ফেলতে পারে, যেখানে তার বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত পুত্র বাপের আড়ালে বিষ উদগীরণ করতে পারে, আর তার মহিমময়ী মূর্তি পুত্রবধূ কি করতে পারে ভগবান জানেন।

ওখানে যে কেবলই একের আড়ালে আর একজনের বিরূপ সমালোচনা শুনতে হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। যে জিনিসটার ভয়ে

এখান থেকে চলে যেতে চাইছে নিমাই। আছে বৈ কি, এখানেও তো ওই ফিসফিসানি আছে। মার আড়ালে বান্টি মার যে সব সমালোচনা করে সেটা হেসে হলেও গলা নামিয়ে। বান্টির মা তাঁর স্বামীর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন সেগুলি মধুরও নয় উচ্চও নয়। আর বান্টির বাবা তাঁর শাশুড়ী সম্পর্কে যে কটূকাটব্য করে থাকেন সেটাও গলা নামিয়ে। কেন কে জানে নিমাইকেই সবাই 'আদালত' মনে করে।

অথবা সংসারে একজন তৃতীয় ব্যাক্তি থাকলেই সে সংসার-সদস্যদের 'আদালত হয়ে দাঁড়ায়, সব নালিশ তার কাছেই এসে হাজির হয়। মানে তার জীবন মহানিশা!

নিমাই তবে কী করবে?

নিমাই কি এই কলকাতাকে সেলাম ঠুকে ফিরে যাবে সেই তার গ্রামে?

সেখানেই কি আকাশ বাতাস সব নির্মল?

হয়তো তা নয়, সেখানেও আছে মানুষের পিছনে মানুষের ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা আর নীচতার নির্লজ্জ প্রকাশ। তবু যেন সেখানে ভয় ভয় করে না।

চিন্তা নিয়ে কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় পরদিন, সাবধানে বান্টির চোখ এড়িয়ে। কারণ ওর এখন পরীক্ষা অন্তের ছুটি চলছে, ওৎ পেতে বসে থাকে যাওয়া-আসার পথে। যেই খাওয়া হয়ে যায় নিমাইয়ের, সেই বান্টি টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। হয়ত মিছিমিছি ওই সামনের দোকানটায় ঢুকে পথের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে দুটো টফি কিনতে থাকে, কি এক ডজন সেফ্‌টিপিন।

নিমাইকে বেরোতে দেখলেই সঙ্গ ধরে, আর বাসের রাস্তা পর্যন্ত বক্‌বক্ করতে করতে যায়।

বড় অস্বস্তিকর।

আজ সেই অস্বস্তিটা ঘটলো না; টুক করে বেরিয়ে পড়তে পারলো বলে মনটা খুশী ছিল নিমাইয়ের। কিন্তু কলেজে গিয়ে একটা কথা শুনে মনটা ধ্বসে গেল।

গতকাল থেকে না কি কলেজে এবং কলেজের বহু ছাত্রের বাড়ি বাড়ি খোঁজ চলছে মৃগাঙ্ক কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে আছে কিনা।

কেন ?

মৃগাঙ্ক নাকি পরশু রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এক বস্ত্রে। ওর বিছানার ওপরে পড়ে ছিল একটা খোলা চিঠি, 'আমি চললাম, আমায় খোঁজবার চেষ্টা করো না। এজীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভয়ও নেই, মরবো না। অন্য জীবনের সন্ধান করতে চাই।'

—মৃগাঙ্ক।

তবু অধীর হয়ে ছুটে এসেছে বাপ-জ্যেঠা, যদি ছেলেমানুষী খেয়াল হয়, যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ থাকে, যদি এখনো কলকাতা ছেড়ে না বেরিয়ে গিয়ে থাকে।

'আপনার সঙ্গে তো খুব ভাব ছিল'—বললো একটা ছেলে, আপনি বলতে পারবেন না ?

নিমাই মাথা নাড়লো।

প্রফেসর প্রশ্ন করলেন, শুনলাম তুমি ওদের বাড়ি টাড়ি যেতে, কোন রকম হিন্টস পাওনি ?

নিমাই বললো না। যেতাম, এখন আর যাই না।

কেন ?

এমনি !

সাধু-সন্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন কোন ইসারা দিতো।

না।

কোনো পলিটিকস্ পার্টিটার্টিতে যোগ দিতে দেখেছো ?

না।

আশ্চর্য। অথচ ক্লাশে নাকি তোমার সঙ্গেই ওর বেশী বন্ধুত্ব ছিল।

নিমাইয়ের ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলে, ছিল, এখন আর নেই। ও মদ খাচ্ছে দেখে বিতৃষ্ণায় সরে এসেছি আমি। কিন্তু বলা তো সম্ভব নয়। তাই শুধু বলতে হয়—আলাপ ছিল এই মাত্র।

তুমি ওদের বাড়ি যেতে না?

যেতাম। তার মানে এ নয় যে, ও আমায় ওর মনের কথা সব খুলে বলবে।

কিন্তু এতেই কি রেহাই পেলো।

মৃগাঙ্কর বাবার সঙ্গে গোকুল এসেছিল, সে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, এই যে বাবু, এই সেই দাদাবাবু।

অতএব আবার জেরা।

বেশ কয়েকদিন মৃগাঙ্কর বাড়িতে গেলেও কর্তাদের দেখা কোনো দিন পায়নি নিমাই। আজ পেলো। দেখলো জেরায় এরা উকিলের উপর যান। এবং রীতিমত সন্দেহই রয়েছে নিমাইয়ের উপর।

অনেক বিরক্তির বৃত্ত পার হয়ে যখন জেরামুক্ত হতে পারলো নিমাই, তখন কেবলি মৃগাঙ্কর সেই ঈষৎ উদাস, ঈষৎ ক্ষুব্ধ অথচ বিশ্বনস্যাৎ করা চেহারাটা মনে পড়তে থাকে।

ঈশ্বর মানতো না মৃগাঙ্ক, বলতো—দূর দূর সব ফাঁকি সব বাজে। স্রেফ ভণ্ড পুরুতদের চালাকি। অথচ নিমাই বারবার বলতে থাকে মনে মনে, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করেছেন।

কে জানে হয়ত মৃগাঙ্ক যাকে নস্যাৎ করতো, মানতে চাইত না, তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। ওই ছেলে যদি পথ খুঁজে পায় তো সে পথে প্রবল বেগে দৌড়বে, যদি পথ খুঁজে না পায়

তলিয়ে যাবে, স্রেফ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবে। কারণ ওর প্রকৃতিতে আছে প্রাবল্য, আছে বেপরোয়া-বেগ।

নিমাই পারে ওর মতো বেরিয়ে পড়তে ?

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে নিমাই। উত্তর পেয়ে মাথা হেঁট করে। অথচ নিমাইয়ের মা নেই বাপ নেই, নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। নিমাই স্রোতের মুখে একটা কুটো মাত্র।

না, নিমাইয়ের কিছুই নেই, শুধু একটা জিনিস আছে। আছে জীবনের প্রতি তীব্র লোভ। এই ফেনিল উচ্ছল নাগরিক জীবনের প্রতি লোভ। নিমাই সুন্দর ঘরের স্বপ্ন দেখে, সুন্দর বাগানের স্বপ্ন দেখে, সুন্দর সাজ সজ্জার স্বপ্ন দেখে,। স্বপ্ন দেখে, কলকাতার অজস্র নাগরিকের মতো নিজের গাড়ি চড়ে ঝা করে বেরিয়ে যাচ্ছে, স্বপ্ন দেখে ভীম গর্জনের রথে চড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

নিমাইয়ের ঠাকুমা খুদ ভাজা জলপান খাইয়ে নিমাইকে মানুষ করেছিল, নিমাইয়ের ঠাকুমা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে বসে নিমাইকে 'বড়' হবার সাধনা করবার মন্ত্র দিয়েছিল। নিমাই সেই বড় হওয়াটার মানে আবিষ্কার করেছে ওই স্বপ্নগুলোর মধ্যে।

নিমাই তাই প্রাণপণে লেখাপড়া করছে।

প্রাণ গেলেও লেখাপড়াটা ছাড়তে পারবে না নিমাই।

নিমাই অতএব ওই দৃষ্টিহীন বুড়ো ভদ্রলোকের দৃষ্টির আলো হতে যাবে। সেখানে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকবার চেষ্টা করবে। আর যাই হোক, সেখানে বাণ্টির মতো মেয়ে ত নেই ? আর বাণ্টির মায়ের মত মহিলা ?

যাঁকে দেখে এসেছে, তিনি আর যাই করুন, বয় ফ্রেণ্ড খুঁজবেন না—এটা ঠিক। হয়তো মৃগাঙ্কর ঠাকুমার মতো বলবেন, 'কী রকম করে খায় দেখো! দেখেই বোঝা যায় জীবনে কখনো খায়নি এসব—।'···হয়তো বলবেন, 'ঠাকুর, বুড়োবাবুর চাকরের জন্যে দু'খানা মাছ রাখবার দরকার নেই, 'একখানা দেবে।'

বলুন।

নিমাই আর অভিমানে খানখান হবে না। নিমাই শুধু দেখবে পরিবেশটা তার পড়াশুনোর উপযুক্ত হচ্ছে কি না।

মৃগাঙ্ক অনেক পেয়েছিল, তাই অনেকটা ছেড়ে যেতে পেরেছে।

ভোগের মধ্যে কী আছে তা মৃগাঙ্কর দেখা হয়ে গেছে, তাই অনায়াসেই ত্যাগের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছে।

নিমাই কবে কী পেয়েছে?

নিমাই সেই পাওয়ার ঘরের দরজায় মোহদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

কলেজ থেকে ফিরে ভারাক্রান্ত মনে নিজের বইপত্র গোছাচ্ছিল নিমাই।

চলে যেতে হবে।

আর চলেই যখন যেতে হবে, আস্তেসুস্থে সব কিছু গুছিয়ে রাখা ভালো। চলে যাওয়াটা তাহলে বেশ স্পষ্ট আর বেশী প্রখর দেখায় না।

পুরনো খাতাগুলো বাঁধছিল একত্র করে—বাণ্টি ঘরে এসে বসে।

নিমাই চোখ তুলে তাকায় মাত্র।

বাণ্টি উঠে দাঁড়িয়ে দুই কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'মুখ কেন হাঁড়ি?

নিমাই গম্ভীর ভাবে বলে' 'হাড়ি মুখের কিছু নেই। অন্য জায়গায় চলে যাবো তাই বইটই গুছিয়ে নিচ্ছি।'

অন্য জায়গায় চলে যাবেন। তার মানে?

নিমাই হাতের কাজ করতে করতেই বলে, 'মানে তো অতি সোজা। চলে যাবো।'

ঈস। চলে অমনি গেলেই হলো? বাণ্টি ঘাড় বাঁকিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'মা বুঝি কিছু বলেছে?'

নিমাই মাথা তুলে স্পষ্ট গলায় বলে, 'বলবেন আবার কি? বলবার আছেই বা কি ?

'বলবার কিছু না থাকলে বুঝি বলা যায় না ?'

বান্টি মিটি মিটি হেসে বলে, ইচ্ছে পূরণ না হলে মানুষ ক্ষেপে গিয়ে অনেক কিছু বলতে পারে।'

'এসব কথা আপনি এরপর অন্য মাস্টার মশাইদের বলবেন। আমার খারাপ লাগে।'

'খারাপ লাগে কেন শুনি ? আমি দেখতে খারাপ ?'

বলে বান্টি নিমাইয়ের বিছানায় বসে পা দোলাতে থাকে।

নিমাই কথা বলে না।

সুটকেস থেকে জামা কাপড়গুলো টেনে টেনে বের করে যেগুলো নিতান্ত নিজস্ব সেইগুলোই শুধু নিয়ে যাবে, যেগুলো এরা দিয়েছে, সেগুলো রেখে যাবে সুটকেশ সুদ্ধ।

বান্টি আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখে।

দেখে সব জামাকাপড় সুটকেসেই রইল। মাত্র দু'চারটি জিনিস একটা তোয়ালেয় জড়িয়ে একধারে রাখলো নিমাই।

ওঃ তার মানে দু'এক দিনের জন্যে কোথাও যাওয়া হবে বাবুর। ঢং করে বলা হচ্ছে 'অন্য জায়গায় চলে যাবো' তার মানে ইয়ার্কি টিয়ার্কি শেখা হচ্ছে।

বান্টি উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে দুই কোমরে হাত দিয়ে একটা পাক খেয়ে হেসে হেসে বলে 'কোথায় যাওয়া হবে ? বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে ?

'বেড়াতে ? গরীবরা আবার বেড়াতে যায় না কি ? বললাম তো চলে যাব।'

'বাজে বকবেন না।'

'বাজে বলেন বাজে। আপনার বাবার কাছে বলতে যাচ্ছি এইবার।'

'বাবা ছাড়বে? শুই আনেন্দই থাকুন।'

নিমাই ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'ছাড়বেন না মানে? কিনে রেখেছেন না কি আমায়?'

'কিনে না রাখুন, কেনা চাকর তো পেয়েছেন একটা?'

বলে হি হি করে হেসে গড়ায় বাণ্টি।

'আপনার জন্যেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।'

নিমাই কড়া গলায় বলে।

'আমার জন্যে? আমার জন্যে আপনাকে চলে যেতে হচ্ছে?'

বাণ্টি দুচোখ কপালে তুলে বলে, 'এই কথা বললেন আপনি?'

'ঠিক কথাই বলছি। নিমাই সামনে গিয়ে বলে, 'আপনার বক্-বকানির জ্বালায় আমার কিছু পড়া হয় না। কি জন্যে তবে আমি পরের বাড়ী পড়ে আছি?'

আচ্ছা আমি আর বক্‌বক্ করবো না।'

'নাঃ, আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কালই চলে যাবো।'

'অন্য চাকরী জোগাড় হয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

'আপনি যেতে পাবেন না।'

'আমি যাবোই।'

হঠাৎ বাণ্টি একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমাইকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার গায়ে মুখ মাথা ঘষতে ঘষতে বলে——'কক্ষনো না! কিছুতেই না। ·······যান দিকিনি কেমন যাবেন আমাকে ছেড়ে। আমি আর একটু বড় হয়ে আপনাকে বিয়ে করবো।'

'ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি—'

'না ছাড়বো না'।

নিমাই চেঁচিয়ে বলে—'বলে দেব আপনার মাকে।'

'বেশ ছাড়ছি। কথা দিন, যাবেন না।'

'কথা দেব কেন ? যাবোই নিশ্চয়।'

'তা'হলে আমি মরে যাবো। আমি মরে যাবো—'

বাণ্টি মরে যাবে শুনে নিমাই কী বলতো কে জানে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হয়।

বেলারাণী এসে দাঁড়ান হাতে কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে।

তার মানে দোকানে গিয়েছিলেন।

বেলারাণী এই দৃশ্য দেখেন।

বেলারাণীর শুধু সর্বশরীরই নয়, চুল গুলোতেও সুদ্ধ যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

বেলারাণী চিৎকার করে ওঠেন, 'শুনছো ? শুনছো ? একবার এদিকে এসো দেখে যাও।'

বেলারাণী দরজায়।

অতএব তাঁর মেয়ের পালাবার পথ নেই।

কিন্তু সে বেচারা কী করবে ? মাষ্টার মশাই যদি তাকে একলা পেয়ে—তার কি ওঁর থেকে গায়ের জোর বেশী ?

কেঁদে ভাসিয়ে সেই কথাই বলে বাণ্টি।

বেলারাণী মেয়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে মাষ্টারের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আশাকরি আর এ বাড়িতে থাকতে পাবার আশা করবেন না।'

মলয়বাবু বারবার দুধকলা আর কাল সাপের কথা তোলেন, আর পৃথিবী যে কি ভয়ানক জায়গা তাই নিয়ে আক্ষেপ করেন।

নিমাই নিজের স্বপক্ষে একটিও কথা বলে না। নিমাই বলে না 'এবাড়ি ছাড়তেই চেয়েছিলাম আমি, তাই এই বিপত্তি।

নিমাই শুধু নিজের বইগুলো গুছিয়ে বেঁধে নেয়, চৌকির তল থেকে তার সেই পুরনো শতরঞ্চ জড়ানো বিছানাটা টেনে বার করে, আর শুধু তার নিজের কেনা দু'একটা জামা কাপড় খবরের কাগজে মুড়ে নেয় সে।

নিমাইয়ের সেই ট্রাঙ্কটা বেলারাণী কবে যেন ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু থাকলেই কি সেটা নিতে পারতো নিমাই? তার গ্রাম জীবনের সেই হাস্যকর চিহ্নটা নিয়ে ঢুকতে পারতো সেই গেট ঠেলে? নিয়ে গিয়ে বসতে পারতো সেই ফুলকাটা মেজের উপর?

পারতো না।

পুরণো জীবনের চিহ্নকে ফেলতে ফেলতেই তো নতুন জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া!

কে জানে সামনের সেই জীবনে কী আছে?

কে জানে ওই ফুলটার অন্তরালে ভয়ানক কিছু লুকিয়ে আছে, না সে ফুল নিমাইয়ের কাছে শুধু ফুল হয়েই থাকবে!

কে জানে কতদিনের এই চাকরী?

মনিব তো তার অশীতিপর।

কতদিন তিনি বই পড়া শুনবেন?

হয়তো দু'দিন বাদেই আবার পথে নামতে হবে নিমাইকে। হয়তো তখন ওর সঙ্গে ওর ঠাকুমার হাতের কাঁথাটাও আর দেখতে পাওয়া যাবে না। হয়তো অধিকতর কোনো সভ্যতার পায়ে তাকে বলি দিয়ে চলে যেতে হবে নিমাইকে।

হয়তো বার বার ঘর আর পথ করতে করতে নিমাইয়ের গাঁয়ের ওই শিশুর মতো সুকুমার মুখটা পাকাটে হয়ে যাবে, হয়তো ওর চোখের ওই দীপ্তিটা ধূসর হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সেখানে একটা সুযোগ সন্ধানীর চোখ উঁকি দেবে।

আর হয়তো তখন সেই চোখের থেকে 'চক্ষুলজ্জা' নামের জিনিসটা ঘুচে যাবে। টাকাটা যে টাকা সেটা বুঝতে শিখবে নিমাই।

হয়তো বা নিমাই তার কলেজে দল পাকানোর পাণ্ডা হয়ে যাবে, হয়তো পলিটিকস্ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করবে। নতুন আসা

ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের টিট্‌কিরি দেবে, উৎখাত করবে, অধ্যাপকদের মুখের উপর চোটপাট করবে, এক কথায় তাঁদের 'ঘেরাও' করতে বসবে, 'এ্যাপলজি' চাওয়াবে।

তখন হয়তো নিমাই ধুতি পরতে লজ্জা পাবে। ট্রাউজার ছাড়া কাজকর্ম চালানো যায় কি করে ভেবে পাবে না।

নিমাই তখন বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে রেঁস্তোরায় খেতে শিখবে, বান্ধবী বাগিয়ে শৌখিন প্রেম করে বেড়াবে।

কলকাতার রংচঙে মলাটটা নিমাইকে উজ্জ্বল হাতছানি দিয়ে ডাকবে। নিমাই সেইটুকুকেই 'কলকাতা' ভেবে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবে।

কলকাতার ওই চকচকে মলাটের নীচে যে জীর্ণ পুঁথিখানা অনেক ইতিহাস বহন করে বসে আছে, তাকে উল্টে দেখবার চেষ্টাও করবে না।

নিমাই নিজেকেই ভুলিয়ে ফেলবে, কোনোদিন সে কলকাতায় ছিল না।

অথবা হয়তো তা'নয়।

হয়তো কলকাতা নিমাইকে জীর্ণ করে ফেলবে, চূর্ণ করে ফেলবে, নিমাই নামের ঝকঝকে তারাটি মৃত উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে।

জীবনযুদ্ধে পরাজিত সেই অকালবৃদ্ধ ছেলেটা আবার কোনো সময় ওই পটলডাঙ্গায় মেসের দরজায় এসে দাঁড়াবে।

তিনভাঁজ গলির প্রথম ভাঁজের মুখে রিকশা রেখে চলে এসে বলবে, 'আচ্ছা এখানে বিনোদবাবু বলে কেউ থাকেন? নয়নবাবু? বসন্তবাবু?

কোনো কেউ হয়তো গলা শুনে বেরিয়ে আসবেন, বলবেন, 'আরে তুমি—ইয়ে—আপনি নিমাই বাবু না? কী চেহরা হয়েছে! তা কি ব্যাপার?'

নিমাই বলবে 'কোনো সিট খালি আছে? পাওয়া যাবে?'

হয়তো তখন ওই উঠোনটায় আর একটু শ্যাওলার স্তর জমবে। হয়তো চৌবাচ্চাটায় ফাটল ধরার জন্যে জল বেরিয়ে বেরিয়ে খালি হয়ে থাকবে।

হয়তো নিমাই সেই চৌবাচ্চার ধারে গামছা পরে উবু হয়ে বসে সাবান ঘসবে।

তবু নিমাই তার বীরভূমের সেই গ্রামটার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে না। সেই তার ভাঙা ভিটের দরজায় এসে বলবে না, 'ভিটেটা তো বেচে খাইনি আমি, এখানে কি জায়গা হবে না আমার?'

যাবে না।

গ্রামকে পিছনে ফেলে একবার যে কলকাতার টিকিট কিনে রেল গাড়ীতে চড়ে বসেছে, আর তার ফেরৎ টিকিট কেনবার উপায় নেই।

কলকাতা তার অক্টোপাশ বাহু দিয়ে চিরতরে বন্দী করে ফেলবে প্রাণীটাকে।

সে বাহু আলোর সমারোহে জ্বলজ্বলে ঝকঝকে চৌরঙ্গী, সে বাহু দোকানের হরিরলুঠ দেওয়া কলেজ ষ্ট্রীট, সে বাহু ফুলকাটা মেজেয় কার্পেট পাতা বালিগঞ্জ, সে বাহু ভ্যাপসা গন্ধ বড়বাজার, সে বাহু অঙ্কে গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ পঞ্চমাঙ্ক নাটক, সে বাহু রহস্যের ব্যঞ্জনা ভরা একাঙ্কিকা, সে বাহু এয়ার কণ্ডিশাণ্ড হেয়ার কাটিং সেলুন, সে বাহু পটলডাঙার মেস।

আকর্ষণের তীব্রতায় কেউ কম যায় না।

ওই আকর্ষণের জাল ভেদ করে দৃষ্টি প্রসারিত হবে না স্কুলের মাঠে, নদীর ধারে, জ্যোৎস্না ঢালা উঠোনে।

যদি কোথাও গিয়ে পড়ে সে দৃষ্টি, তা হয়তো পড়বে তার কাদায় হাঁটু বসা রাস্তায়। তার সাপ ব্যাং বিছেয়।

শহর কলকাতা যে ওর সমস্ত ঐশ্বর্যই আত্মসাৎ করে রেখে দিয়েছে, তা মনে পড়বে না।

না, মনে পড়বে না। কলকাতা যাকে একবার গ্রাস করে, তাকে আর ফেরৎ দেয় না।

কিন্তু নিমাইয়ের ভবিষ্যৎটা কী তা কে বলতে পারে এখন ?

এখন তো নিমাই শুধু এক আশ্রয় থেকে চ্যুত হয়ে অন্য এক আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। যার সামনেটা সম্পূর্ণ অজানা।

অজানা—

তাই জেনে যাওয়া পিছনটাই এখনো যেন টানতে চাইছে।

তাই বিষণ্ণ একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে চিন্তাটা পাক খাচ্ছে নিমাইয়ের।

দিদিমা যে কাল বলে রেখেছিলেন, পাঁজিটা একটু দেখো দাদা, কাল বোধ হয় একাদশী,—সেই ইঙ্গিতময় কথাটা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে—খোকা বলে রেখেছিল, 'সামনের শনিবার তুমি আমায় খেলা দেখাতে নিয়ে যাবে, বুঝলে ? আমায় কেউ নিয়ে যায় না। অথচ একাও যেতে দেয় না। নিয়ে যাবে তো ?' সেই কথাটা মনে পড়ছে।

আসবার সময় যে বেলারাণী মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'সুটকেসটা নিয়ে যাবে না কেন ? ওটা তো তোমারই ছিল।' সেটা মনে পড়ছে। হয়তো এই জন্যে বেশী করে মনে পড়ছে, এই প্রথম বেলারাণী নিমাইকে 'তুমি, বললেন বলে।

এই মনে পড়াগুলোই হয়তো সঞ্চয়।

যেগুলো মনে পড়াতে ইচ্ছে হয় না, সেইগুলোই ক্ষয়। ক্ষয় আর সঞ্চয়, এই নিয়েই তো এগিয়ে চলা। এর মধ্যে থেকেই কেউ বা অমৃতকুম্ভের সন্ধান পায়, কেউ বা স্বর্গ হারায়।

———

-ঃ আমাদের অনুমোদিত পরিবেশক ঃ—

● **উত্তর বঙ্গ**

জে, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

মালদা

● **মুর্শিদাবাদ**

বুক কর্ণার

বহরমপুর

● ২৪ **পরগনা**

অনুপমা

কোর্ট রোড

বনগ্রাম

● **আসাম**

পুঁথিঘর

সেন্ট্রাল রোড

শিলচর

পপুলার স্টোর্স

ধুবড়ী আসাম

● **ত্রিপুরা**

মডার্ণ বুক সোসাইটি

আখউড়া রোড

আগরতলা

● **বেনারস**

মুখার্জী বুক ডিপো

পাণ্ডে হাউলি

বেনারস

ইতিপূর্বে এই গ্রন্থটি "নীলকদর" নামে প্রকাশিত হয়েছিল।